†deªæqvwi 2023 ▪ gvN-dvêyb 1429

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ভাষা আন্দোলন: অবিনাশী আলোকবর্তিকা

চাই বাংলা ভাষার জন্য আরও ভালোবাসা

cvKWZK m¤ú` myi¶eb

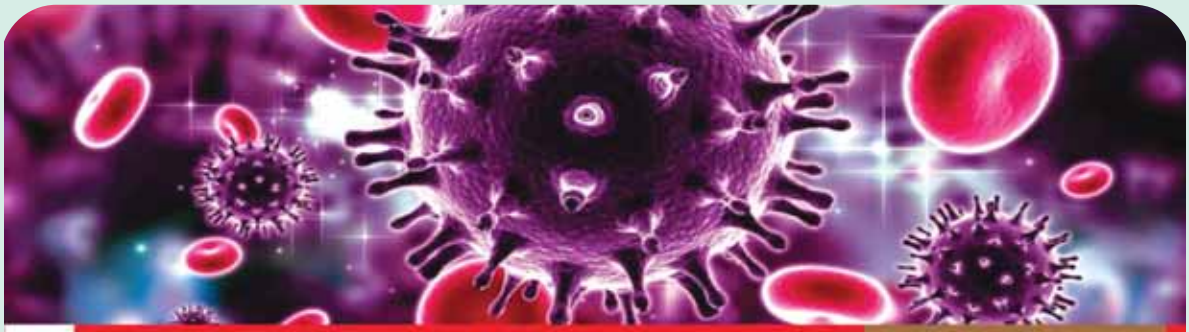

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- nVvr Ri, Kwk ev Mjve¨v_v Ae¯vq Amy‡eva Ki‡j ¯vbxq wmwfj mvRb, Dc‡Rjv ¯v¯¨ KgKZvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡b|

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

Pjw”PÎ I cKvkbv Awa`ßi, Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ⌟ মাঘ–ফাল্গুন ১৪২৯

প্রথম শহিদমিনার

সম্পাদকীয়

বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও একুশের পথ ধরেই। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এদিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ সেদিন ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিকসহ অনেকে শহিদ হন। তারই পথপরিক্রমায় বাংলা ভাষা পায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়েছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়। ভাষার মাসে সকল ভাষাশহিদ ও ভাষাসৈনিকদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা।

বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা। করোনা মহামারির পর এবছর অমর একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এবং এর সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হলো সুন্দরবন, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন। ঝড়-ঝঞ্ঝায় এদেশকে রক্ষা করছে সুন্দরবন। ১৯৯৭ সালে এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ বনের অপরিসীম গুরুত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এর সঠিক পরিচর্যাও। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন দিবস। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সংখ্যা। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ধর্মগ্রন্থে ভাষার নানা প্রসঙ্গ ৪
ড. মোহাম্মদ হাননান

চাই বাংলা ভাষার জন্য আরও ভালোবাসা ৭
প্রফেসর ড. মাহবুবুল হক

ভাষা আন্দোলন: বাঙালির আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ ও স্বাধীনতার প্রথম সোপান ১২
ড. খান আসাদুজ্জামান

নতুন রূপকথার হাতছানি ১৬
হাছিনা আক্তার

ভাষা আন্দোলন ও আমাদের দায় ১৮
রফিকুর রশীদ

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ২০
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

একুশের বইমেলা: বিশ বারের উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩
রহিম আব্দুর রহিম

আমার বাংলা ভাষা ২৬
শ্যামল দত্ত

গ্রন্থ পাঠ ২৮
শওকত জাহান

একুশের জানা অজানা গান ৩০
মঈনুল হক চৌধুরী

কথাসাহিত্যে সুন্দরবন ৩১
গাজী আজিজুর রহমান

ফাগুনের রঙে রঙে ভালোবাসা ৩৪
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সুন্দরবন ৩৬
সুরাইয়া শিমুল

নিরাপদ খাদ্য রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ ৪০
নাজমুন নাহার

গল্প

একুশ ৪৫
আফরোজা পারভীন

কবিতাগুচ্ছ **৩৮-৩৯, ৪৩-৪৪ ও ৪৮-৪৯**
জাহাঙ্গীর আলম জাহান, রোকসানা গুলশান অলিতাজ মনি, রীনা তালুকদার, কামাল বারি সপ্তিকা চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, খোরশেদ আলম নয়ন, মনির জামান, আবু তৈয়ব মুছা ইশরাত আরা দ্যুতি, শাহাদত হোসেন সুজন, ফরিদ সাইদ, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, বিচিত্র কুমার, বেগম শামসুন নাহার, জাহাঙ্গীর আলম, রনি অধিকারী এম ইব্রাহীম মিজি, সাবিত্রী রানী, সোহেল রানা আনসার আনন্দ, আশরাফ পিন্টু, অসীম বিভাকর গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫০
প্রধানমন্ত্রী ৫০
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫২
শিক্ষা ৫৪
উন্নয়ন ৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫
অর্থনীতি ৫৭
নারী ৫৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৮
কৃষি ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬০
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক জহুরুল হক মুন্সি ৬৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

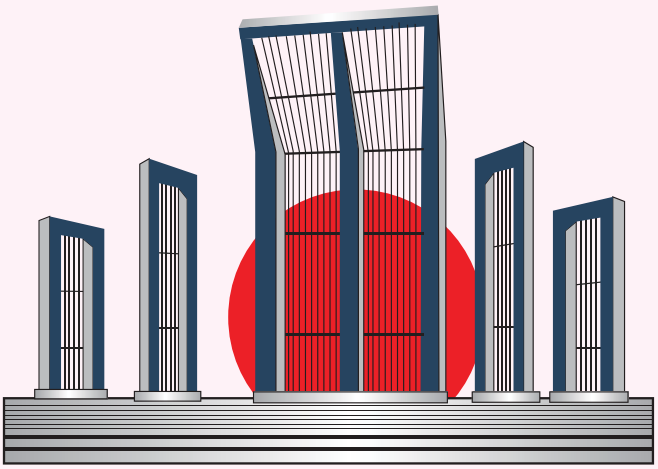

ভাষা আন্দোলন: অবিনাশী আলোকবর্তিকা

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল এক গৌরবময় অধ্যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় আসীন। ১৯৫২ সালের এদিনে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়। পাকিস্তানি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে প্রাণোৎসর্গ করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বার আরও নাম না জানা ভাষাশহিদের আত্মত্যাগে আমরা ফিরে পাই বাংলা ভাষার অধিকার। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ যে অর্জন মহান স্বাধীনতা, তার বীজও উপ্ত ছিল এই একুশের চেতনার মধ্যেই। ভাষা আন্দোলনের চেতনা অবিনাশী। একুশ অবিনাশী আলোকবর্তিকা। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে 'ধর্মগ্রন্থে ভাষার নানা প্রসঙ্গ', 'ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ ও স্বাধীনতার প্রথম সোপান', 'ভাষা আন্দোলন ও আমাদের দায়', 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান' 'আমার বাংলা ভাষা' ও 'একুশের জানা অজানা গান' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা- ৪, ১২, ১৮, ২০, ২৬ ও ৩০

চাই বাংলা ভাষার জন্য আরও ভালোবাসা

ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও চেতনার গভীর প্রভাব রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাবাহী জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্বই হলো মাতৃভাষা বাংলাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে নানান বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারে বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে। বিশ্বায়নের যুগেও বাংলা ভাষা শক্তি অর্জন করছে। এ নিয়ে রয়েছে 'চাই বাংলা ভাষার জন্য আরও ভালোবাসা' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা- ৭

প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। আবহমানকাল থেকে গড়ে ওঠা সুন্দরবন নিজ গুণেই অনন্য। বিচিত্র সব প্রাণীর বাস এ বনে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন দাঁড়ায় বাধার দেয়াল হয়ে। সুন্দরবন বাংলাদেশের ঐতিহ্য। সুন্দরবন সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও করেছে প্রভাবিত। সুন্দরবন নিয়ে 'কথাসাহিত্যে সুন্দরবন' ও 'জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সুন্দরবন' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা- ৩১ ও ৩৬

ধর্মগ্রন্থে ভাষার নানা প্রসঙ্গ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বর্তমান দুনিয়ায় কতগুলো ভাষা আছে, আর কতগুলো ভাষায় মানুষ কথা বলে, এর সঠিক পরিসংখ্যানটি হয়ত পাওয়া যাবে না। কারণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানে, এসব ভাষায় কথা বলার আর একজনও লোক থাকছে না। আগামী একশো বছরে পৃথিবী থেকে তিন হাজার ভাষা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ভাষাবিদরা। [সূত্র: Ethnologue-The Languages of the world, 1999]। সে হিসাবে গড়ে প্রতি দুসপ্তাহে একটি করে ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অথবা যাবে।

দুনিয়ায় তালিকাভুক্ত ভাষার সংখ্যা ৬০৬০টি। এর মধ্যে মাত্র তিনশো ভাষা দিয়েই দুনিয়ায় অধিকাংশ মানুষের কথা বলার কাজটি হয়ে যাচ্ছে। ৫০টির মতো ভাষা আছে, যে ভাষাগুলোতে মাত্র একজন করে মানুষ কথা বলে। এর অর্থ, ঐ একজন করে মানুষের মৃত্যু হলে ঐ ৫০টি ভাষারও মৃত্যু হয়ে যাবে। ৫০০টির মতো ভাষা পৃথিবীতে আছে, যার মাধ্যমে কথা বলে মাত্র ১০০ জন করে লোক। ঐ ১০০ জনের মৃত্যু হলে মৃত্যু হবে আরও ৫০০টি ভাষার।

দুনিয়ার ভাষাগুলোর অবস্থান দৈশিক নয়, তা জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং গোষ্ঠীভুক্তও। পাপুয়া নিউগিনি নামে বিশ্বে একটি রাষ্ট্র আছে, যা এমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেই একটি দেশে ৮১৭টি ভাষা চালু রয়েছে কথা বলার জন্য। অথচ চীন এত বড়ো দেশ, শতকোটিরও বেশি মানুষের বাস, সেখানে ভাষা মাত্র ২০৫টি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে চালু আছে ৪০৭টি ভাষা। [সূত্র : এ জেড এম আবদুল আলী: 'বিশ্বের ভাষা নিয়ে কথা', *একুশে ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* শীর্ষক পুস্তিকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০১]।

আমাদের বাংলাদেশে ভাষার সংখ্যা কত? আমাদের জানা আছে কি? কম করে হলেও ৩০টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সংখ্যা দিয়ে একটি তালিকা দেখানো যায়। যেমন: ১. বাংলা ২. চাকমা ৩. মারমা ৪. ওরাঁও ৫. ত্রিপুরা ৬. গারো ৭. লুসাই ৮. সাঁওতালী ৯. মণিপুরী ১০. রাখাইন ১১. রামর‍্যে ১২. মারো ১৩. কুরুক ১৪. ককবরক ১৫. হাল্লামী ১৬. নাইতুং ১৭. ফাতুং ১৮. উসুই ১৯. আচিক ২০. কুচিক ২১. মাফি কুচিক ২২. আবেং ২৩. সাগেতাং ২৪. আত্তং ২৫. দুলিঅ্যানটং ২৬. কারমেলি ২৭. মাহলেস ২৮. মণিপুরী মৈতৈ ২৯. খালাছাই। এ ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাগুলোর কিছু কিছু নামেই আলাদা আলাদা দেখানো হয়, একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক অনেক মিল রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আবার সামান্য কিছু পার্থক্যের জন্যও নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা নাম হয়েছে।

পৃথিবীর এতগুলো ভাষা, এ ভাষাগুলো কেমন করে এক থেকে অন্যে ভিন্ন হলো, তার নানারকম ব্যাখ্যা ভাষাবিদদের কাছে রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থ *তৌরাত শরিফ*, যা মুসা আ.-এর আমলে নাজিল হয়েছিল (যদিও মূল *তৌরাত শরিফ* পাওয়া এখন এক কঠিন কাজ), তার থেকে কিছু তথ্য নেওয়া যায়। *তৌরাত শরিফ*-এ ভাষার জন্মকথা নিয়ে একটি ছোট্ট অধ্যায় রয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

> তখনকার দিনে সারা দুনিয়ায় মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের শব্দগুলো ছিল একই। পরে তারা পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব্যাবিলন দেশে একটা সমভূমি পেয়ে সেখানেই বাস করতে লাগল।...
>
> তারা বলল, 'এস, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর তৈরি করি এবং এমন একটা উঁচু ঘর তৈরি করি যার চূড়া গিয়ে আকাশে ঠেকবে'।...
>
> মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরি করছিল তা দেখবার জন্য মাবুদ নেমে আসলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক; সেজন্যেই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করবার জন্য এরপর এরা আর কোনো বাধাই মানবে না। কাজেই এসো, আমরা নিচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে'।
>
> তারপর মাবুদ সেই জায়গা থেকে তাদের সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন। এতে তাদের শহর তৈরির কাজও বন্ধ হয়ে গেল। এই জন্য সেই জায়গার নাম হল ব্যাবিলন, কারণ সেখানেই মাবুদ সারা দুনিয়াতে 'ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন'। [*তৌরাত শরিফ: পয়দায়েশ*, সূত্র:

কিতাবুল মোকাদ্দস, বিবিএস, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১২]।

মূল *তৌরাত শরিফে* এ কথাগুলো কেমন করে ছিল তা আজ আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। তবে বাইবেল সোসাইটি অনূদিত ও প্রচারিত এ *তৌরাত শরিফ* নিঃসন্দেহে স্রষ্টার প্রতি বিদ্বেষমূলকভাবে তৈরি করেছে। বান্দারা কী শহর ও ঘরবাড়ি তৈরি করেছে তা দেখার জন্য আল্লাহর নীচে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। আর 'এসো, আমরা নিচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই'– এমন বাক্য আল্লাহর হতে পারে না। 'গোলমাল' একটি নেতিবাচক শব্দ, আল্লাহ এভাবে কথা বলবেন না। আর শেষ লাইনটিও আপত্তিকর মন্তব্য দ্বারা পূর্ণ। বলা হয়েছে, 'মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন'। এ লাইন পড়ে আল্লাহ বা মাবুদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হবে না, বরং নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেবে। ভাষা প্রসঙ্গে *তৌরাত শরিফের* নামে এ ভাষ্য বিভ্রান্তিমূলক।

এরপর আমরা দেখতে পারি ভাষা প্রসঙ্গে *ইঞ্জিল শরিফের* ভাষ্য। *ইঞ্জিলের* করিন্থীয় ভাষ্যে যীশু বলছেন,

> ১. আমি যদি মানুষের এবং ফেরেশতাদের ভাষায় কথা বলি কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা বা ঝনঝন করা করতাল হয়ে পড়েছি। যদি নবী হিসেবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার থাকে, যদি আমি সমস্ত গোপন সত্যের বিষয় বুঝতে পারি, আর যদি আমার সবরকম জ্ঞান থাকে, ... কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমার কোনই মূল্য নেই। [*ইঞ্জিল শরিফ*, সপ্তম খণ্ড, করিন্থীয় ভাষ্য, সূত্র : কিতাবুল মোকাদ্দস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৪২-২৪৩]।

অন্যত্র, যীশুরই ভাষ্যে,

> ২. ... অন্য কোনো ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মানুষের কাছে কথা বলে না কিন্তু আল্লাহর কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বুঝতে পারে না। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৩]।
>
> ৩. আমি চাই যেন তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পার, কিন্তু আরও বেশি করে চাই যেন তোমরা নবী হিসেবে কথা বলতে পার। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৬]।
>
> ৪. অন্য কোনো ভাষায় যে লোক কথা বলে, জামাতের লোকদের গড়ে তুলবার জন্য যদি সে তার কথার মানে বুঝিয়ে না দেয়, তবে তার চেয়ে নবী হিসাবে যে কথা বলে সে-ই বরং বড়। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৩]।
>
> ৫. এজন্য অন্য কোনো ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মুনাজাত করুক যেন তার মানে সে বুঝিয়ে দিতে পারে। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪]।
>
> ৬. আমি যদি অন্য কোনো ভাষায় মুনাজাত করি তবে আমার রূহই মুনাজাত করে কিন্তু আমার মন কোনো কাজ করে না। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৩]।
>
> ৭. ... তা না হলে যদি তুমি রূহে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাও তবে সেই ভাষা বুঝতে পারে না এমন কোনো লোক যদি সেখানে উপস্থিত থাকে, তবে সে কেমন করে তোমার শুকরিয়াতে আমিন বলে সায় দেবে? সে তো জানে না তুমি কি বলছ। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৩]।
>
> ৮. আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বেশি পারি বলে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই। তবে জামাতের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার কথা বলবার বদলে অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি বুদ্ধি দিয়ে বরং মাত্র পাঁচটা কথা বলব। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৩]।
>
> ৯. ... ঈমানদারদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা কোনো চিহ্ন নয়, বরং অ-ঈমানদারদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৪]।
>
> ১০. জামাতের সমস্ত লোক এক জায়গায় মিলিত হলে পরে যদি সবাই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে থাকে আর তখন সেই জামাতের বাইরের লোকেরা এবং অ-ঈমানদারেরা ভিতের থাকে, তবে কি তারা তোমাদের পাগল বলবে না। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৪]।

ইঞ্জিল শরিফের এ যুক্তিগুলোর কোনো ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে নেই। ফলে ভাষা বিষয়ে এখানকার উপস্থাপিত জটিল বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য বের করা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বলা যায় অথবা ভাবা যায়, বিভিন্ন রকম ভাষা সেই প্রাচীন আমলেই দুনিয়াতে ছিল।

পবিত্র *কোরানে*ও ভাষা প্রসঙ্গে নানা আয়াত রয়েছে। প্রথমে আমরা দেখব ৩০ নম্বর সূরা রুম-এর ২২ নম্বর আয়াত। এতে বলা হচ্ছে,

> তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের (মানুষের) ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য অবশ্যই দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অন্যত্র, সূরা ইব্রাহিম-এর আয়াত :

> আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক রসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাঁরা (রসুলরা) যাতে (আমার কথা) তাদের (লোকদের) কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে।... আল্লাহই শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী। [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত নম্বর-৪]।

নবি মোহাম্মদ সা.-এর জামানার কোরানের তাফসিরকার আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রা. প্রথমে উদ্ধৃত সূরা রুমের আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

> ... এবং তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা যেমন আরবি, ফারসি ইত্যাদি ও বর্ণের বৈচিত্র্য, যেমন লাল, কালো ইত্যাদি। [*তাফসীরে ইব্ন আব্বাস*, তৃতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭,

পৃষ্ঠা-২৪-২৫]।

বর্তমান জামানার *কোরানের* তাফসিরকার মুফতি শাফী র. এ আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেছেন,

> খোদারী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন... হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য, যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না।
>
> স্তর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষায় বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহতালা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে।...
>
> এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। [মুফতি শাফী র.-এর তাফসিরকৃত *পবিত্র কোরআনুল করীম*, মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪১৩ হিজরি, পৃষ্ঠা- ১০৪১-১০৪২]।

ইব্ন আব্বাস রা. তাঁর তাফসিরে শেষোক্ত সূরা ইব্রাহিমের দুটো ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, ১. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাঁর আপন সম্প্রদায়ের ভাষাসহ পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে, তাদের ভাষায় যা তাঁদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে। ২. অপর ব্যাখ্যায়, এমন ভাষাসহ রাসূল প্রেরণ করেছি, যে ভাষায় তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বুঝে নিতে সক্ষম হয়। [তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫৬]।

আধুনিক জামানার কোরান তাফসিরকার মুফতি মুহাম্মদ শাফী র. তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেন,

> বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শতশত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরান অবতীর্ণ হওয়া এবং রসুলুল্লাহ পৃথক পৃথক শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তাদের মাধ্যমে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।...
>
> তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরান একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসুলের ভাষাও কোরানের ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। [*পবিত্র কোরআনুল করীম*, মুফতি শাফী র.-এর তাফসির, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিজরি, পৃষ্ঠা-৭১১-৭১২]।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা ভাব প্রকাশ করতে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তার কথা *কোরানের* আরও নানা সূরায় প্রকাশিত হয়েছে। সূরা আর-রহমান-এর প্রথমেই আল্লাহ তাআলার বর্ণনা :

> পরম করুণাময় আল্লাহ। তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। [বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: *কোরান শরিফ সরল বঙ্গানুবাদ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪০৩]।

আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রা. এর তাফসির করেছেন,

> তিনিই (আল্লাহ) তাকে (মানুষকে) শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সব কিছু বর্ণনা করতে শিখিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। [*তাফসীরে ইব্ন আব্বাস*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৬]।

মুফতি শাফী র. এর তাফসির করেছেন আরও ব্যাপকভাবে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।... প্রথমে কোরান শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে।
>
> ... এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ...। [মুফতি শাফী র.-এর তাফসির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩১৬-১৩১৭]।

ধর্মগ্রন্থে ভাষা প্রসঙ্গের আয়াতসমূহ এবং এর তাফসির চমকপ্রদ। এতে ভাষা প্রশ্নে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব ও বিজ্ঞান মনস্কতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সমগ্র দুনিয়ায় একটিমাত্র ভাষা না হয়ে, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার জন্মের রহস্যটিও মানব জাতির ইতিহাসের সঙ্গেই সংযুক্ত। ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষার বাস্তবতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, যা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হয়েছে।

ড. মোহাম্মদ হাননান: ইতিহাসবিদ ও গবেষক

চাই বাংলা ভাষার জন্য আরও ভালোবাসা

প্রফেসর ড. মাহবুবুল হক

আঞ্চলিক ভাষাবৈচিত্র্য ছাড়াও বাংলা ভাষার একটা প্রমিত বা মান রূপ রয়েছে। সেই প্রমিত রূপ আমরা ব্যবহার করি সাহিত্যে, লেখাপড়ায়, পরিশীলিত কথোপকথনে ও আনুষ্ঠানিক কথাবার্তায়। সেই প্রমিত বাংলা এখন ব্যাপকভাবে বুলিমিশ্রণের সম্মুখীন।

অন্য যে-কোনো ভাষার মতো বাংলা ভাষাও নিয়ত প্রবহমান। তা দীর্ঘকাল ধরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা মিথস্ক্রিয়া ও পালাবদলের মধ্য দিয়ে তাতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। অন্য ভাষা থেকে যোগ হয়েছে নতুন নতুন অনেক শব্দ। বদলে গেছে অনেক শব্দের চেহারা, উচ্চারণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনা। বদল ঘটেছে পদক্রমের। তাই ভাষার মিশ্রণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় মিশ্রণ ঘটে আসছে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কালপর্বে বাংলা ভাষা সংস্পর্শে এসেছে অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু। এসব ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক ভাষিক উপাদান যুক্ত হয়েছে বাংলা ভাষায়।

এভাবে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে অনেক ঋণশব্দ ও বিভিন্ন ভাষিক উপাদান। এক্ষেত্রে অন্য ভাষার সবকিছুই এ ভাষা গ্রহণ করেনি, নিয়েছে যেটুকু প্রয়োজন এবং যতটুকু বাংলা ভাষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্তীকরণ করা গেছে ততটুকু। এভাবে বাংলা ভাষায় বুলিমিশ্রণের ঘটনা ঘটেছে নিরন্তর। এই বুলিমিশ্রণ প্রধানত ঘটে নিত্যদিনের মুখের ভাষায়। পরে তার কিছু প্রভাব পড়ে লিখিত ভাষাতেও। এই প্রক্রিয়াই অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষার বিকাশের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

তবে কখনো কখনো বাংলা ভাষার ওপর জবরদস্তি করে অন্য ভাষার উপাদান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এক সময় সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রমুখকে সক্রিয় লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। পাকিস্তানি আমলে শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষায় জোর করে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি।

২

বাংলা ভাষায় এখন যথেষ্ট বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে ইংরেজি বুলিমিশ্রণের বেলায়। এই বুলিমিশ্রণ কখনো কখনো ঘটছে জেনে-বুঝে এবং ইংরেজির মেশাল দেওয়া হচ্ছে ইচ্ছেমতো। এর ফলে বাংলা ভাষার মাধুর্য রক্ষিত হচ্ছে না, তার বিকৃতিও ঘটছে। বিশেষ করে এক শ্রেণির বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত নাটক ও সিনেমায় আঞ্চলিক ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করে মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেওয়ার জন্যে। আরও দুঃখজনক হলো, সেই আঞ্চলিক ভাষাকেও বিকৃত করা হচ্ছে ইচ্ছেমতো। নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সংলাপে আঞ্চলিকতা থাকা দোষের নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যচালিত হয়ে প্রমিত বাংলাকে বিকৃত বা অবমূল্যায়ন করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হলে তা মেনে নেওয়া যায় না। সম্প্রতি নাটকে উদ্বেগজনকভাবে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। উৎকট উচ্চারণ প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তা মৌখিক প্রমিত বাংলার বিকৃতিতে সহায়ক হতে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা। তথাকথিত আধুনিকতার নামে বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ থেকে সচেতনভাবে সরে আসার জন্যেও কোনো কোনো গোষ্ঠী সচেষ্ট। তাতে বাংলা-ভাষা-প্রিয় দর্শক-শ্রোতা বিচলিত বোধ করছেন। অনেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। বাংলা ভাষা নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, সম্প্রতি বেতার ও টেলিভিশনে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ তথা ভাষাদূষণ হয় এমন সংবাদ পাঠ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে উচ্চ আদালত।

চরিত্রের কথোপকথনে সাবলীলতা ও স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা আনার জন্যে আঞ্চলিক ও আটপৌরে ভাষা ব্যবহার অসঙ্গত নয়।

এক্ষেত্রে শিল্পীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবার ব্যাপার যে, বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাবের এই যুগে যেসব শিশুকে প্রমিত বাংলা ভাষা শিখতে হচ্ছে ব্যাপক বুলিমিশ্রণ তাদের প্রমিত বাংলা শেখার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। কোমলমতি শিশুদের প্রমিত ভাষা শেখাতে হলে অবশ্যই হিন্দি ছায়াছবি, হিন্দি ধারাবাহিক, ইংরেজি ছায়াছবি ও নানারকম কিম্ভূত বাংলার প্রভাব বলয় থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

এক সময় শিশুদের ভাষা শেখা ও ভাষা চর্চাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করত শিশুসাহিত্য ও শিশুতোষ পত্রিকা। শ্রেণি-পাঠাগার, স্কুল-পাঠাগার এবং পারিবারিক ও স্থানীয় পাঠাগারগুলোর আকর্ষণীয় সংগ্রহ তাদের মনের খোরাক জোগাতো। এখন সে সুযোগ খুবই সীমিত। স্কুলের পড়া আর কোচিংয়ের পর তাদের খুব-একটা সময়ও থাকে না। যেটুকু সময় হাতে থাকে তা কেটে যায় কম্পিউটার-নির্ভর নানারকম খেলায় কিংবা কার্টুন দেখায়। ফলে প্রমিত বাংলা শেখার অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় শিশু।

সম্প্রতি কার্টুন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে শিশুদের মধ্যে কথায় কথায় হিন্দি বলার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এটি উদ্বেগজনক। এক্ষেত্রে উচিত হবে, আকর্ষণীয় ও বিশ্বখ্যাত কার্টুনগুলোকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তা না হলে এই প্রবণতা বাংলা ভাষার জন্যে প্রকট সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে।

বর্তমানে এক শ্রেণির বাঙালির ঘরে ঘরে টিভির প্রভাবে শিশু-কিশোর-যুবকরা হিন্দি ছবি, কার্টুন দেখে, গান শুনে হিন্দি চর্চায় আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের অনেকেই ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু মেশানো বাংলায় কথা বলে নিজেদের অত্যন্ত আধুনিক ও কেতাদুরস্ত ভাবছে। উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একাংশও কথায় কথায় ইংরেজি বুলি ব্যবহার করছেন। তাতে অবচেতনে বাংলা ভাষার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের নামকরণে কেবল ইংরেজির আধিপত্য বিস্তৃত, টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামকরণেও তা লক্ষণীয়। যেমন টিভি চ্যানেলের ইংরেজি নামের মধ্যে রয়েছে: আরটিভি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, এনটিভি, এসএ টিভি, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, এশিয়ান টিভি, চ্যানেল নাইন, চ্যানেল আই, ডিবিসি নিউজ, নিউজ টুয়েন্টি ফোর, বাংলাভিশন, যমুনা, মাই টিভি ইত্যাদি। তবে, এর পাশাপাশি একাত্তর বাংলা, একুশে, দেশ, সময়, মাছরাঙা, মোহনা, বিজয়, বৈশাখী, দিগন্ত ইত্যাদি টিভি চ্যানেলের নামকরণ বাংলা ভাষাপ্রীতিকেই সমুন্নত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। টিভি চ্যানেলগুলো যেসব অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে সেগুলোর নামকরণে ইংরেজি ব্যবহারের প্রবণতা সত্যিই লজ্জা ও আশঙ্কাজনক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ইংরেজি নামের মধ্যে রয়েছে : আওয়ার ডেমোক্রাসি, আজকের রেসিপি, এনটারটেইনমেন্ট, ওয়ার্ল্ড মিউজিক, কমেডি আওয়ার, ক্লাস রুম, গেম শো, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড, জিরো আওয়ার, টক শো, টপ চার্ট, টপ মডেল, টিউন ফ্যাক্টরি, টেলি কুইজ, টোটাল স্পোর্টস, ট্রাভেল অন, ডক্টরস চেম্বার, ড্যান্স ফর ইউ, নিউজ আওয়ার, নিউজ আওয়ার এক্সট্রা, নিউজ অ্যান্ড ভিউজ, নিউজ টুয়েন্টি ফোর, পাপেট শো, প্রিংকস অ্যান্ড ডেজার্ট, ফিফটি মিনিটস, ফেইস টু ফেইস, বিউটি টাইম, বিজনেস টক, বিজনেস ভিশন, বিজিদের ইজি শো, বিটস আনলিমিটেড, ব্রাইডল শো, মার্কেট ট্রেন্ড, মিউজিক ট্রেন, মিউজিক বক্স, মিউজিক্যাল লাউঞ্জ, মিট দ্য মেকার্স, মিডিয়া গসিপ, রিপোর্টার্স ডায়রি, লাইফ স্টাইল, লিড নিউজ, লুক অ্যাট মি, শপারস গাইড, শপিং অ্যান্ড কুকিং, সিনেমা এক্সপ্রেস, সিনে হিটস, সেলিব্রেটি লাউঞ্জ, স্টার কমেডি শো, সেলিব্রেটি সিক্রেট, স্টার্স ফান, স্টুডিও কনসার্ট, স্পোর্টস টাইম, স্পোর্টস টুয়েন্টি ফোর, স্পোর্টস ডেইলি, স্পোর্টস ভিশন, হাই লাইভ, হাউস ফুল ইত্যাদি। এ থেকেই কি বোঝা যায় না যে, বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতির ওপর ইংরেজির আগ্রাসন কী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে?

টিভির অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়ও কোনো কোনো গণমাধ্যমের বাংলা ভাষার প্রতি রয়েছে মারাত্মক উন্নাসিকতা। সেসব টিভির উপস্থাপক-সঞ্চালকরা শ্রোতা-দর্শকদের 'প্রিয় শ্রোতা' বা 'প্রিয় দর্শক' বলে সম্বোধন করতে সংকোচ বোধ করেন, তারা বলেন 'ডিয়ার ভিউয়ার্স', 'ডিয়ার লিসেনার্স'। তারা কখনো গান বাজিয়ে শোনান না, সব সময় 'সং প্লে' করেন। কোনো কোনো টিভি নাটকের সংলাপও ভাষা বিকৃতিতে ভূমিকা রাখছে। এ ধরনের নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপের প্রভাবে তরুণদের মধ্যে চালু হয়েছে এক ধরনের ডিজ্যুস বোলচাল। তারা 'অসাধারণ' না বলে বলেন 'অ'সাম', 'খুব সুন্দর' না বলে বলেন 'জোশ', 'খুব ভালো' না বলে বলেন 'হেব্বি'। তারা অথবা তাদের পেছনের কুশীলবরা ইচ্ছাকৃতভাবে জগাখিচুড়ি 'বাংলিশ' ভাষারীতি তৈরির এবং নতুন প্রজন্মকে বুলিমিশ্রণে প্ররোচিত করায় সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে উপযুক্ত শব্দ থাকলেও কথায় কথায় ইংরেজি বাক্‌ভঙ্গি ও পদবন্ধ ঢুকিয়ে দেওয়ায় তারা তৎপর। তারা 'যাহোক' না বলে বলেন 'অ্যানি ওয়ে' , 'প্রসঙ্গত' না বলে বলেন 'বাই দি ওয়ে', 'চমৎকার' না বলে বলেন 'একসেলেন্ট'। এমনিভাবে তাদের কথায় অবলীলায় স্থান পায় 'একসকিউজ মি', 'গুড জব', 'টাইম নাই', 'সাইড দেন' ইত্যাদি প্রয়োগ। পাশাপাশি 'ওকে', 'প্লিজ', 'বাই', 'বাট', 'গ্রেট', 'সো', 'ডেয়ারিং' ইত্যাদি বুলির ব্যবহারও লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। 'আংকল' ও 'আন্টি' শব্দ সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়ে গেছে। এর ফলে অচিরেই হয়ত চাচা, মামা, ফুফা, চাচি, মামি, ফুফু ইত্যাদি আত্মীয়বাচক শব্দ বিরল প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া ইংরেজি ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাংলা ক্রিয়ার মিশেল দিয়ে 'একসিডেন্ট করা', 'কেয়ার করা', 'ক্যাশ করা', 'পেমেন্ট করা', 'প্রফিট করা', 'লস খাওয়া', 'লোন নেওয়া' ইত্যাদি বুলিমিশ্রণ অবলীলায় শিক্ষিত সমাজে চলছে। বুলিমিশ্রণে ভুল প্রয়োগেরও ছড়াছড়ি ঘটে। যেমন:

> আমাকে ফোন দিও। (ফোন করার বদলে ফোন দান করা?)
>
> ওর বিহেভ ঠিক না। (বিহেভ ক্রিয়াপদ; হওয়া উচিত : বিহেভিয়া')
>
> ওকে লট অফ রিমাইন্ড দিয়েছি। (হবে : আ লট অফ রিমাইন্ডা)

অন্তর্জালেও (ইন্টারনেটে) এ ধরনের ব্যাপার ঘটছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্লগে ব্যবহৃত হচ্ছে কিম্ভূত বাংলা। তাতে বাংলিশ যেমন আছে তেমনি অদ্ভুত ধরনের সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। অন্তর্জালে বিপ্লব রহমান 'বাংলা ব্লগের ভাষা ও দিকদর্শনসমূহ' শীর্ষক একটি লেখায় তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। এখানে সেটি উদ্ধৃত হলো–

একটি মজার ফটো-ব্লগ পোস্ট দেখে একজন পাঠক মন্তব্যের ঘরে জানতে চাইলেন :

এসব ফটুক পাইলেন কৈ? জানতে মঞ্চায়!

পোস্টদাতার উত্তর : খোমাখাতা + গুগলাইয়া।

মন্তব্যদাতা : হাহামগে!

পোস্টদাতা : ডিজিএম!

মন্তব্যদাতা : আরো পোস্টান!

পোস্টদাতা : দিমুনে, অহন দৌড়ের উর্প্রে আছি।

যারা বাংলা ব্লগের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন, তাদের জ্ঞাতার্থে বললে 'ভদ্রভাষায়' কথোপকথনটি হবে অনেকটা এ রকম:

মন্তব্যদাতা : এসব ছবি কোথায় পেয়েছেন? জানতে মন চায়।

পোস্টদাতা : ফেসবুক ও গুগল সার্চ ইঞ্জিন থেকে।

মন্তব্যদাতা : হাসতে হাসতে মরে গেলাম!

পোস্টদাতা : দূরে গিয়ে মর!

মন্তব্যদাতা : দয়া করে এ রকম আরও পোস্ট দিন।

পোস্টদাতা : পরে দেব, এখন খুব ব্যস্ত আছি। ... ইত্যাদি।

এ ধরনের সংলাপকে স্বাভাবিক ভাবেই ভাষাদূষণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ব্লগে এ ধরনের ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সংলাপ ও মন্তব্যকে রসালো করে হাসির খোরাক জোগানো। প্রমিত বাংলা ব্যবহারে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। প্রবন্ধকার এ প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ-নির্ভর মন্তব্যে বলেছেন যে, এই মিশ্রিত বুলি কোনোভাবেই ব্লগের প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচিত ও পাঠকনন্দিত হয়নি। বরং প্রমিত বাংলাই ব্লগের প্রধান ভাষা এবং সব ধরনের ভাবগম্ভীর লেখায় ব্যবহৃত হচ্ছে প্রমিত বাংলা।

তবে কোনো কোনো ব্লগে 'কমেন্টাইছেন', 'পোস্টাইছেন', 'ব্লগাইছেন', 'লগাইছেন' ইত্যাদি কিম্ভূতকিমাকার শব্দের ব্যবহার দেখে বিচলিত হতে হয়।

৩

বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলার ক্ষেত্রও যেন ক্রমেই বাড়ছে। দাপ্তরিক ব্যবহারে বাংলা ভাষা অনেক জায়গায় অবহেলিত। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বাসগৃহ, সাংস্কৃতিক সংস্থা, টিভি সম্প্রচার সংস্থা, এমনকি কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের উৎকট প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি দেশীয় পণ্যের নামকরণেও ইংরেজিয়ানার ব্যাপক প্রভাব চোখে পড়ে। সেসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নামফলকেও ইংরেজি ভাষার একচেটিয়া প্রাধান্য। আর নগরগুলোর অবয়বকে ঢেকে ফেলা অজস্র বিজ্ঞাপন ফলকেও ইংরেজি ভাষার ছড়াছড়ি। নিজেদের চৌকস ও আধুনিক ভাবে উপস্থানের এ এক ন্যক্করজনক প্রবণতা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে মাতৃভাষার অধিকার পেতে রক্তাঞ্জলি দিতে না হলেও তারা তাদের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের নামফলকে নিজেদের ভাষাই ব্যবহার করেন। ফরাসি দেশে, জার্মানিতে, মধ্যপ্রাচ্যের বড়ো বড়ো শহরে এমনটিই দৃশ্যগোচর হবে। সেসব দেশে তাদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষা ব্যবহার করা চলে, কিন্তু নিজস্ব ভাষা ব্যবহৃত না হলে জরিমানা দিতে হয়। এ বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়েই আমরা বোধ হয় স্বস্তি পাই। আমরা কি পারি না

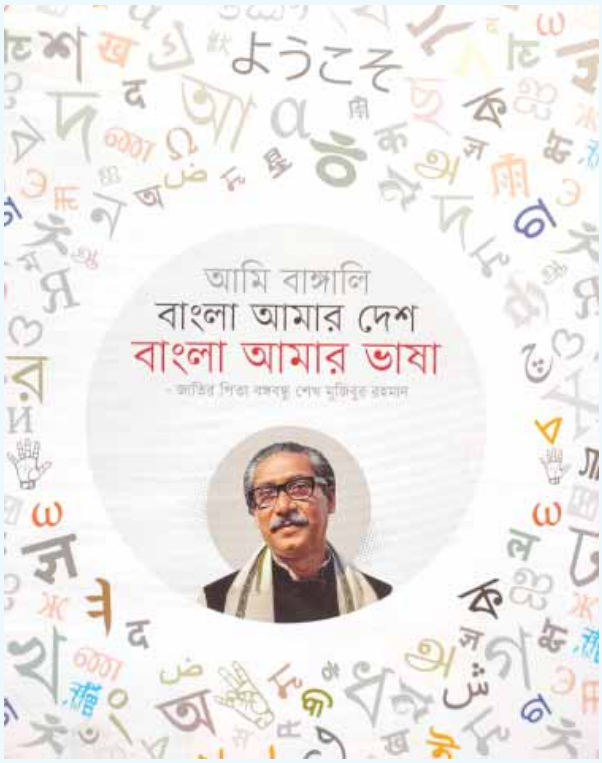

ফটোফিচার: নিখিলেশ চক্রবর্তী

নামফলক, বিজ্ঞপ্তি ফলক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে অন্য ভাষা ব্যবহার সীমিত করে আবশ্যিকভাবে বাংলা ব্যবহারের নিয়ম করে দিতে?

বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে ইংরেজিয়ানা। সড়ক ও সড়ক-সংলগ্ন স্থানের নামকরণে রোড, হাইওয়ে এভিনিউ, স্কোয়ার, স্ট্রিট, হাইওয়ে প্লাজা ইত্যাদি সর্বত্রই চোখে পড়ে। পরিবহণের নামের বেলায় ট্রান্সপোর্ট, গেইটলক, সিটি সার্ভিস, অল দ্য ওয়ে ফার্স্ট ক্লাস, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোকানের নামের ক্ষেত্রে শপ, শপিং কমপ্লেক্স, শপিং মল, শপিং সেন্টার, এমপোরিয়াম, বুটিক হাউস, চেইন স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মেগাশপ, সুপার শপ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড শপ, ফার্মেসি, স্টোর, সেলস কর্নার, সেলস সেন্টার ইত্যাদি শব্দের ছড়াছড়ি। বাসার নামের বেলায় ম্যানশন, লজ, ভিলা, হাউস, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি অহরহ চোখে পড়ে। এসব কখনো কখনো বাংলা বর্ণমালায় লেখা হয়, তবে ভাষা ইংরেজি। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও ইংরেজিতে। এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গেলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণে 'ভিক্টোরিয়া', 'কুইনস', 'রয়্যাল' ইত্যাদি নামের মহিমার প্রতি এদেশের এক শ্রেণির লোকের আনুগত্য এখনও বহাল রয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইংরেজির যে মিশ্রণ ঘটছে তাকে বাংলিশ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এক শ্রেণির বেতার মাধ্যম। কোনো কোনো এফএম রেডিওতে যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয় তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজি ভাষার শব্দ। এফএম বেতারগুলোর বাংলিশ ভাষার উৎকট ও ব্যাপক ব্যবহার ও বিকৃত উচ্চারণ ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি চলছে অদ্ভুত ধরনের উচ্চারণ বিকৃতি। বাংলা উচ্চারণকে বিকৃত করে এক ধরনের 'ডিজ্যুস' উচ্চারণ চালু করায়

উঠে পড়ে লেগেছে এক শ্রেণির তরুণ। ইংরেজিয়ানা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সচেতনভাবে। তারা 'আমাদের' উচ্চারণ করে 'আমাদেড়', 'রেডিও'-ও বদলে বলে 'ড়েডিও'। তাদের বাংলা বুলিতে তারা ব্যবহার করে ইংরেজি উচ্চারণভঙ্গি। তার অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তরুণদের মধ্যে।

কম্পিউটারে ও মুঠোফোনে বাংলা ফন্টের ব্যবহার শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের বাধ্য হয়ে হয় ইংরেজি ভাষায়, না-হয় বাংলা কথাকে ইংরেজি হরফে লিখে বৈদ্যুতিন বার্তা (ই মেইল), খুদে বার্তা (এসএমএস) লিখতে হয়েছে। তাও পরোক্ষ ইংরেজি আধিপত্যের নামান্তর।

আমাদের অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতিতেও বিদেশিয়ানাকে সাড়ম্বরে জায়গা করে দিচ্ছি আমরা। বাংলা গানের ভাবসম্পদকে লালন না করে বিয়ে, গায়েহলুদ, জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, বাসে-রেস্তোরাঁয় ইংরেজি-হিন্দি গান বাজানো হচ্ছে হরদম। সাম্প্রতিককালে আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার ঘটছে বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এসব অনুষ্ঠানে কোনো বিদেশি অতিথি থাকেন না। তবু নব্বই শতাংশ আমন্ত্রণপত্র তৈরি হয় ইংরেজি ভাষায়। এ প্রবণতা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালির একটা অংশ ক্রমেই হয়ে পড়ছে বাংলিশ সংস্কৃতির ধারক-বাহক। তার প্রভাব পড়ছে সাধারণ বাঙালির জীবনেও।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে প্রমিত বাংলা ভাষার চর্চা নেই বললেই চলে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষা বলতে গেলে পুরোপুরি উপেক্ষিত। দেশের মাটিতে জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি এদের অন্ধ আকর্ষণ এবং লেখায় ও বাচনে প্রমিত বাংলা ব্যবহারে এদের অদক্ষতা বাংলা ভাষার প্রতি চরম উপেক্ষারই প্রকাশ।

৪

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির মমত্বের অভাব নেই। তাই প্রশ্ন জাগে, এমনটি ঘটছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই এর পেছনে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের থাবা বিস্তারের ব্যাপার লক্ষ করেছেন। তাদের মতে, বর্তমান পৃথিবী এক ধরনের ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ বা ভাষা-আধিপত্যবাদের হুমকির সম্মুখীন। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার নতুন কৌশল হিসেবে ভাষা এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর বিশ্বের ভাষা পরিমণ্ডলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে ইংরেজি ভাষা। তা অব্যাহত রয়েছে তথাকথিত বিশ্বায়নের ছত্রছায়ায় নতুন কৌশলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখতে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ লিপ্ত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একচেটিয়া প্রভাব-বলয় তৈরি করায়। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক, ভাবাদর্শগত ও ভাষাগত আধিপত্য বিস্তারের নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ শতকে নানাভাবে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ায় পুঁজিবাদী দুনিয়া নিয়েছে নতুন পন্থা। বিশ্ববাসীর মন থেকে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ইত্যাদি ভাব-ধারণা মুছে ফেলতে বা ভুলিয়ে দিতে নতুন যুগের ভাব-ধারণা হিসেবে বিশ্বায়নকে করা হয়েছে জনপ্রিয়। একে সুনির্দিষ্ট জাতি-রাষ্ট্রীয় সীমার ঊর্ধ্বে আসীন এক মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সামনে আনা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ কথাটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে বিশ্বায়ন কথাটা ব্যবহার করা হলেও ক্রমেই তার ভূমিকা ও স্বরূপ স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে অর্থপুঁজি অন্য সব পুঁজির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়া ঔপনিবেশিক চাপের মুখে তাদের বাজার খুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে। প্রধানত বহুজাতিক করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষায় এসব দেশকে বাধ্য করা হচ্ছে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে রাষ্ট্রীয় বাজেট কমাতে এবং সেসব বেসরকারি খাতে তুলে দিতে।

বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে এমন অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কয়েক দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। তা ভূখণ্ডগত চৌহদ্দির সীমাকে ছাপিয়ে দূর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এনে দিয়েছে বিশ্বায়নের নৈর্ব্যক্তিক প্রভাবকেন্দ্রের কাছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বহুজাতিক করপোরেশন ক্রমবর্ধমান হারে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য আরোপ করছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। ভূখণ্ডের সীমানা পেরুনো এক ধরনের সংস্কৃতি তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বে। তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিজেদের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী বাজার ও সংস্কৃতিকে যথাসম্ভব অভিন্ন প্রকৃতির করা। এর ফলে পোশাক, খাদ্য, জীবনযাত্রা, ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ক্রমেই বিপন্ন হচ্ছে জাতীয় বৈশিষ্ট্য। মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও ভাষাকে তারা সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে। গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাদের হাতে। আর তারা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করছে ভাষা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়।

বিগত প্রায় ৫০০ বছর ধরে ইংরেজি সবচেয়ে বিস্তরণশীল ভাষা হিসেবে গণ্য।

ভাষা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ও মার্কিন নীতির সারবত্তা তুলে ধরেছেন যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ রবার্ট ফিলিপসন তাঁর *লিংগুইস্টিক ইমপেরিয়ালিজম* (১৯৯২) গ্রন্থে। তাতে ২০১০ সালে ইউনেসকো লিঙ্গুয়াপ্যাক্স পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ভাষাবিদ দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্র সরকারিভাবে বিশ্ব ভাষা হিসেবে

ইংরেজির প্রসারকে সমর্থন করে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইংরেজি প্রধান বিশ্ব ভাষার অবস্থানে উপনীত হতে পারার মুখ্য কারণ, এই ভাষাকে ইংরেজিভাষী প্রধান রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো।

এর প্রভাব আমাদের দেশেও প্রকটভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রশাসন, বাণিজ্য, উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, প্রবাসী জীবন গ্রহণের ইচ্ছা চরিতার্থতা ইত্যাদি কারণে বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজি শেখাকে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বাংলার বিকল্পে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থাও ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রমের আওতায় এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে পেশা হিসেবে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষকতার সুযোগ দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে।

আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি ভাষার বিস্তার প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বায়নের ছত্রধারী নতুন সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় অবস্থান ও কর্তৃত্ব, সাংস্কৃতিক শিল্পোদ্যোগ, বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে আধিপত্যমূলক অবস্থানে রয়েছে। এই ভাষার গুরুত্ব মেনে নিয়েই এর আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অনেকেই জাতীয় ভাষার অবস্থান সংরক্ষণে জোরালো ভূমিকা গ্রহণকে অপরিহার্য বলে মনে করছেন। বাংলা ভাষার মতো ঐতিহ্যবাহী ভাষাও এর হুমকি ও আগ্রাসনের শিকার হতে বসেছে। তাই বাংলা ভাষাকে আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করা জাতীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। আগ্রাসন ও হুমকি প্রতিরোধে দরকার সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য।

৫

ইংরেজি ভাষা বা অন্য কোনো ভাষা বাংলা ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে কিংবা করায় প্রয়াসী কি না, সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সচেতনতা দরকার। যারা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন তাদের প্রত্যেককে গভীর মমতা দিয়ে এ সমস্যা উত্তরণের পথ সম্পর্কে ভাবতে হবে। ভাষা যে বিপর্যয়ের দিকে চলেছে তার গতি রোধ করতে হবে। বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

সেই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির অবস্থান বেশ শক্ত। তাকে গুরুত্ব না দিলে কিংবা ইংরেজি শিক্ষাকে পরিহার করলে চলবে না। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে ইংরেজি শেখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে বহির্বিশ্বে উচ্চতর শিক্ষালাভ কিংবা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন খুবই দরকার। এটা মনে রেখেই আমাদের স্থির করতে হবে, এই টানাপড়েনের মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাব? ইংরেজিয়ানার স্রোতে কি আমরা ভেসে যাব? বিদেশি ভাষার গাউন পড়ে বিদেশি সাজার জন্যেই কি মাতৃভাষা বাংলার জন্যে শহিদেরা রক্ত দিয়েছিলেন? আসলে ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে– এটা মান্য, কিন্তু তাই বলে কখনো বাংলাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। আর তাই বাংলাদেশে ভাষা শিক্ষার মূল মাধ্যম হতে হবে বাংলা ভাষা, আর ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষা শিখতে হবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে।

বাংলা ভাষা বর্তমানে যে সংকটের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে তা মোকাবিলার একটি পথ হচ্ছে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ানো। দ্বিতীয় পথ হলো, বাংলা ভাষার শক্তিকে বাড়ানো। তাকে আরও সমৃদ্ধ করা। এর জন্যে বিশ্বায়নের যুগে চাই বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন।

আশার কথা, এখন কম্পিউটারে, অন্তর্জালে ও মুঠোফোনে বাংলা ভাষার ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বাংলা ভাষায় বৈদ্যুতিন বার্তা, খুদে বার্তা পাঠানো যাচ্ছে। বাংলা ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক লিপি সংকেতায়ন ব্যবস্থা তথা ইউনিকোডে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্তর্জাল অনুসন্ধান প্রক্রিয়াতেও এখন বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামাজিক অন্তর্জাল আনন বইয়েও (ফেসবুক) বাংলা ব্যবহার বাড়ছে। অন্তর্জালে বাংলা ব্লগ এলাকা চালু হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণরা ব্লগে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টিতে তারা রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্লগে প্রমিত বাংলায় লেখালেখি, অভিমত প্রদান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় চালু হয়েছে উইকিপিডিয়া। তাও ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অভ্র সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইউনিকোডে সহজেই এসব ক্ষেত্রে বাংলা লেখা সম্ভব হচ্ছে। বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো বাঙালি পল্লি। লন্ডনে-আমেরিকায় বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ হচ্ছে। বাংলা ভাষায় পত্রিকা বের হচ্ছে। এভাবে বিশ্বায়নের যুগেও বাংলা ভাষা শক্তি অর্জন করছে। এসব থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যদি সচেতনভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে থাকি, ভাষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করি, তবে নিজের শক্তিতেই বাংলা ভাষা সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে এগিয়ে যাবে।

১৯৫৯ ও ১৯৬০-এর দশকে বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে চালু করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন ঘটেছিল। বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষার পায়ের তলার মাটিকে আরও শক্ত করার জন্যেও দরকার নতুন ধরনের আর একটি আন্দোলন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ সর্বমান্য করার জন্যেও চাই রাষ্ট্রের ভূমিকা ও তৎপরতা।

প্রফেসর ড. মাহবুবুল হক: বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ, সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

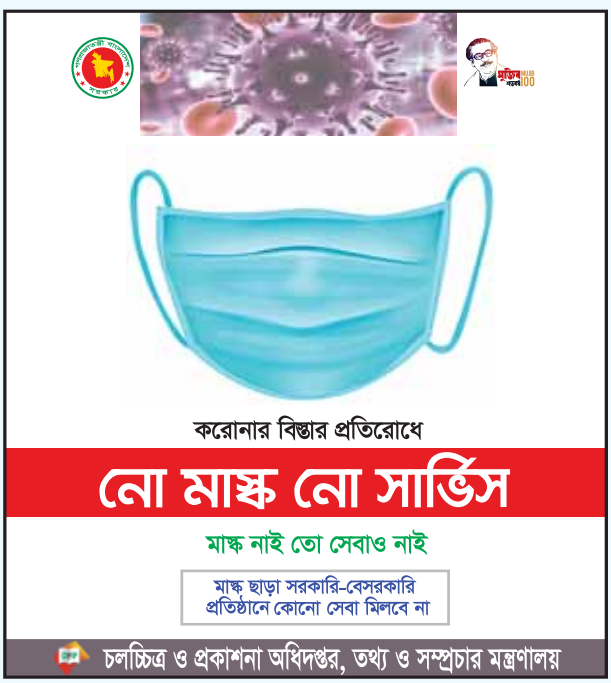

ভাষা আন্দোলন

বাঙালির আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ ও স্বাধীনতার প্রথম সোপান

ড. খান আসাদুজ্জামান

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে দিয়েছে তার আপন সত্তা আবিষ্কারের পরম মহিমা, জাতীয় ঐক্য ও আপন ঠিকানা তথা স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য প্রেরণা। এদেশের রক্ত ধারায় রঞ্জিত প্রাণে বাঙালি জাতি তার সর্বাত্মক মুক্তির শপথ গ্রহণ করে। এরই চরম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১-এ সূচিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জন হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে উদ্ভাসিত হয় লাল সূর্যের দেশ– বাংলাদেশ। বাংলার আকাশে চির প্রোজ্জ্বল হয়ে পত্ পত্ করে উড়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণের পতাকা। কবির ভাষায় 'সবুজের বুকে লাল, সূর্যটা ঝলমল উচ্ছল প্রাণের বন্যা'।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমি মূলত সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। ১৯৪৭ সালে যাত্রা শুরু করে ঘটনার পরম্পরায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুকে আসামি করে ১৯৬৮'র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০'র নির্বাচন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৭১'র ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসী ও আপোশহীন নেতৃত্বে এক সুতীব্র আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তথা মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। বলা যায়, স্বদেশ ও স্বজাতির সবটুকু সোনালি অর্জনের সঙ্গে মিশে আছে একটি নাম; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সঙ্গত কারণেই ভাষা সৈনিক গাজীউল হক বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিরাট, বলা যেতে পারে এটি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই বিশাল প্রেক্ষাপটে ততোধিক বিশালত্ব নিয়ে বিরাজিত একটি নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ; একটি অপরটির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত। তাই এসব বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে আসতেই হয় আমাদের'।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের আগেই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের শাসকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে এবং একইসঙ্গে এ অঞ্চলের তখনকার সচেতন যুবসমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষার চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন– কাজী ইদ্রিস, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজশাহীর আতাউর রহমান, আখলাকুর রহমানসহ আরও কয়েকজন। আলোচ্য বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের যুবসমাজের করণীয় কী? উল্লেখ্য যে, এর কয়েকদিন আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এরই দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। দৈনিক *আজাদে* প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. জিয়াউদ্দীন উপস্থাপিত প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি প্রস্তাব দিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যদি একটি রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে গণতন্ত্রসম্মতভাবে শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই যৌক্তিক বক্তব্য দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখনকার প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার ধারক যুবসম্প্রদায়কে। এমনি প্রেক্ষাপটে সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে বৈঠকটি আয়োজিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। ঐ অধিবেশনে উপস্থিত কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন, পাকিস্তানের ছয় কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) চার কোটি ৪০ লাখ মানুষের ভাষা বাংলা। কাজেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। পরবর্তীতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী তীব্র ভাষায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয়, মুসলিম লীগ দলের কোনো বাঙালি সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ

দত্তকে সমর্থন করে কথা বলেননি। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনও উর্দুর পক্ষ অবলম্বন করেন।

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এই অপতৎপরতার যৌক্তিক প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ তারা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ ভূমিকায় ছিলেন। তারা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুসহ অন্যরা এর পক্ষে জনমত বাড়াতে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করেন। এ সময় কয়েকটি স্থানে তিনি বাধার মুখেও পড়েন।

১১ই মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' উপলক্ষে পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন ভোরবেলা শত শত ছাত্র ইডেন বিল্ডিং, জিপিও ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করেন। পুরো ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে যায়। ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশ লাঠিপেটা করে। নানা জায়গায় অনেক ছাত্র আহত হন। ঐদিন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ সত্তর-পঁচাত্তরজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে আন্দোলন দানাবেধে ওঠে। স্বাধীন পাকিস্তানে এটিই শেখ মুজিবের প্রথম গ্রেপ্তার। তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। এই সময় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জুল আলী, ডা. মালেক, খান এ সবুর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন এবং আরও অনেক সদস্য ছাত্রদের পুলিশ কর্তৃক মারধর ও জেলে প্রেরণের প্রতিবাদ করেন। উক্ত পরিস্থিতিতে খাজা নাজিমউদ্দীন ঘাবড়ে গেলেন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হলেন।

উল্লেখ্য যে, ১১ই মার্চের আন্দোলন ও ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য শেখ মুজিবসহ অন্য নেতৃবৃন্দ আগেই ঢাকায় চলে আসেন। ১০ই মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা হয়। সভায় কিছু বক্তার আপোশকামী মনোভাব দেখে শেখ মুজিব বলেন, 'সরকার কি আপোশ প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমউদ্দীন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে'। শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত আলী ও শামসুল হক প্রমুখ। অলি আহাদ তাঁর *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'সেদিন (১০ই মার্চ) সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন, তা হলে ১১ই মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না।'

ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নাজিমউদ্দীন সরকারের আলোচনার পর উভয়পক্ষ মিলে একটি সমঝোতা চুক্তি প্রণয়ন করে। বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ জেলে থাকায় চুক্তিপত্রটি তাঁদের অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাশেম ও কামরুদ্দিন আহমেদ গোপনে জেলে নিয়ে যান এবং শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদ বন্দিদের পক্ষে খসড়া চুক্তির শর্তাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন করেন। চুক্তির প্রধান প্রধান শর্তগুলো ছিল– বন্দিদের মুক্তি, পুলিশি নির্যাতন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্ত, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন, সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। আট দফা চুক্তিটি ১৫ই মার্চ সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমউদ্দীন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত মোতাবেক ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব ও অন্য নেতৃবৃন্দসহ বন্দিরা মুক্তি লাভ করেন।

আন্দোলন যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে, সে জন্য ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্র সমাবেশ ডাকা হয়। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। বিখ্যাত আমতলায় এটিই শেখ মুজিবের প্রথম সভা। তিনি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুধু ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সাত মাস পর ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের জাতির পিতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে আসেন। ২১শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে ঘোষণা করেন,

'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' শেখ মুজিব তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বলেন, "আমরা প্রায় চার পাঁচ-শত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সে সভায়। অনেকে হাত তুলে জানিয়ে দিল মানি না, মানি না। ২৪শে মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' তখন ছাত্ররা তার সামনেই বসে চিৎকার করে বলল– 'না, না, না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর পুনরায় বক্তৃতা করেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তার মুখের উপরে তার কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন, আর কোনো দিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে স্মারকলিপি দাখিল করা হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করার পর ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কিছুটা দ্বিধা ও হতাশার জন্ম হয়েছিল। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই জিন্নাহর গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি ছিল। ছাত্রসমাজের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময় কেউ কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে জিন্নাহর অবস্থানকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। এ সময় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের দূরদর্শিতা লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, 'নেতা অন্যায় করলেও ন্যায়ের স্বার্থে তার প্রতিবাদ করতে হবে। বাংলা ভাষা শতকরা ৫৬ জন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।' সাধারণ ছাত্ররা শেখ মুজিবকে সমর্থন করলেন। এরপর ভাষার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন, শোভাযাত্রা অব্যাহত থাকে।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বসে। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যদিও প্রস্তাবটি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব ছিল না, তথাপি এর পর থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে, যদিও ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে যথারীতি ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। এরপর খাদ্যের দাবিতে এক ভুখা মিছিল বের করা হয়। পুলিশ মিছিলে আক্রমণ করে। শেখ মুজিব কৌশলে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু শেখ মুজিব ৩১শে ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় এলে উল্লিখিত জনসভায় সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একটানা ২৬ মাস রাজনৈতিক (নিরাপত্তা) বন্দি হিসেবে জেলে আটক রাখে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং নুরুল আমিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব পান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রথম ঢাকায় আসেন ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি। ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় খাজা নাজিমউদ্দীন বক্তৃতা করেন এবং পুনরায় ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তার এ ঘোষণার পর ১৯৪৮ সালের চেয়েও ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি'। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ও তরুণদের বাইরে এটিই প্রথম সভা যেখানে বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমবেত হন। এ সভায় পূর্বে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'-এ রূপান্তরিত করা হয়। কাজী গোলাম মাহবুব এ পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। এ পরিষদের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন– শামসুল হক চৌধুরী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল হাসিম, আতাউর রহমান খান, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল হক, আবদুল মতিন, মির্জা গোলাম হাফিজ, আবদুল গফুর, খয়রাত হোসেন, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ প্রমুখ। ঐ সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তরুণ রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমদ তখন জেলে বন্দি ছিলেন। অসুস্থতার ভান করে শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হাসপাতাল থেকেই শেখ মুজিব গোপনে মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শওকত আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, গোলাম মাওলা প্রমুখের সঙ্গে সভা করে জানিয়ে দেন ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে, হরতাল হবে এবং অ্যাসেম্বলি ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হবে। এদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁদের দীর্ঘ কারাবাস (২৬ মাস) থেকে মুক্তির জন্য ১লা ফেব্রুয়ারি সরকারের কাছে আবেদন করেন এবং জানান যে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের মুক্তি দেওয়া না হলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে জেলের ভেতর অনশন ধর্মঘট করবেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের দুজনকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন ফরিদপুর জেলেই অনশন করলেন। দুই দিন পর অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে তাঁদের জোর করে নল দিয়ে তরল খাবার দেওয়া হলো। এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের অনশনের বিষয়টি ২০শে ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন মুলতবি প্রস্তাব হিসেবে উত্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন নির্লজ্জভাবে এর বিরোধিতা করেন।

ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক ঢাকায় ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টার দিকে মাইকে ১৪৪ ধারা জারি করে আগামী এক মাস ঢাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকা বেতারেও এ খবর প্রচারিত হয়। এ খবর প্রচারিত হওয়ার পরই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দ ৯৪ নবাবপুরস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জরুরি সভায় বসেন। সভায় অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যুক্তি দেখালেও কর্মপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা বিপক্ষে ভোট প্রদান করে। তবে এ রাতেই ফজলুল হক হলের পুকুরপাড়ে ছাত্রনেতাদের বৈঠকে পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন– গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, মোহাম্মদ সুলতান, এম আর আখতার মুকুল, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মমিন, এস এ বারী এটি, সৈয়দ কামরুদ্দিন শহুদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রসমাজের বৃহত্তর অংশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১০টা থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমা হতে থাকে। বটতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা ভঙের প্রস্তাব দেন। সহস্র কণ্ঠ গর্জে উঠল ১৪৪ ধারা মানব না, মানব না। সিদ্ধান্ত মতে, ১০ জন ১০ জন করে ছাত্র মিছিল করে অ্যাসেম্বলি ভবনের দিকে যেতে থাকে। পুলিশ ছাত্রদের প্রথম দলটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট থেকে বের হতেই পুলিশবাহিনী তাড়া করে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এমএলএ ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকেন। পুলিশ

বেপরোয়াভাবে ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। বাধ্য হয়ে ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার শহিদ হন এবং আরও ১৭ জন গুরুতর আহত হন। রাতে আবুল বরকত মারা যান। গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকাসহ সারা দেশের পরিস্থিতি পালটে যায়। অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসেন। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে গায়েবি জানাজায় লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটে। শহরে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। জানাজা শেষে শোভাযাত্রা বের হলে হাইকোর্টের সামনে পুনরায় গুলিবর্ষণে বেশ কজন হতাহত হন। ঐ দিন বংশাল রোডে সরকার সমর্থক *দৈনিক সংবাদ* অফিসে জনতা হামলা চালায়। সেখানে পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম নিহত হন। নওয়াবপুরে পুলিশের গুলিতে মারা যান হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান।

২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে শেখ মুজিব জেলে বসে ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলির খবর পেলেন। ফরিদপুরেও হরতাল হয়েছে। ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসে বিভিন্ন স্লোগান দেন– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লেখেন, 'মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙ্গালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। ... আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই।' অবশেষে ২৭শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে অনশন ভঙ্গ করানো হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান তাঁকে নিয়ে যেতে জেলগেটে আসেন।

অপরদিকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি নির্মিত হয় শহিদমিনার। ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মরণে একের পর এক রচিত হয় কবিতা ও গান। ভাষার জন্য আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে প্রথম ২২শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে বসে মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী লিখেন, 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। কবি ও গীতিকার আবদুল লতিফের রচনায় 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়'। সাংবাদিক ও বহুমাত্রিক শিল্পস্রষ্টা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রচনায় সৃষ্টি হয় ভাষাশহিদ স্মরণে চিরন্তর শাশ্বত গীতবাণী– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'। ঢাকা শহরে তৈরি হলো কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। সেই থেকে বাঙালি জাতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় প্রতিবছর ভাষাশহিদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ভাষার জন্য এই আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্তের দ্যুতি আজ বিশ্বব্যাপী সঞ্চারিত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পেয়েছে 'আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস' রূপে।

'মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো'– এ কেবলই বিশ্ব বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, এটি মাতৃভাষার প্রতি সর্বকালের, সব মানুষের এক চিরন্তন অনুভূতি। উল্লেখ্য যে, একুশের রক্ত ধারায় রঞ্জিত প্রাণে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় যে স্বাধিকার আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়, তার পথ ধরেই একের পর এক চলতে থাকে পরবর্তী আন্দোলন ও সংগ্রাম, যা ১৯৭১ সালে মুক্তির সংগ্রাম ও চূড়ান্ত বিজয়ের পথকে সুগম ও চির সঞ্জীবিত করে। সেই থেকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন আর থামেনি। ঘটনার পরম্পরায় ১৯৫২ থেকে একের পর এক আসে ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮। অতঃপর এই সব নানা বঞ্চনার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১-এ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে, যা ছিল গোটা বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কিন্তু ওরা জনতার এই বিজয়কে মানতে চাইলো না, মানতে রাজি নয়।

আর এই অবধারিত মহাবিস্ফোরণের কঠিন আঘাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই বাঙালির ভাগ্যে চলে আসে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ নামক ইতিহাসের একটি জঘন্য ও ঘৃণ্যতম কালরাত্রির দানবীয় থাবা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙালি ব্যাঘ্র হুংকারে ঘুরে দাঁড়ায়। আমরা নয়টি মাস রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধ করি। অতঃপর ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিপাগল বাঙালিরা নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা পাকিস্তানি উর্দুওয়ালা হায়েনার থাবার হাতকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানিরা অসহায়ের মতো প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে, আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়। ৩০ লক্ষ শহিদের লোহিত রক্তের উষ্ণ স্রোত বেয়ে অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিনিয়ে আনা হয় সেই আরাধ্য বিজয় ও স্বাধীনতা। সবুজের মাঝে লাল সূর্য আঁকা একটি পতাকা, বিশ্ব মানচিত্রে চির ভাস্বর হয়ে উদ্ভাসিত হয়– সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বপ্নের একটি ঠিকানা 'বাংলাদেশ'। ভাষা আন্দোলন হলো বাঙালির আত্মোপলব্ধি, আত্মজাগরণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার-স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সোপান।

ড. খান আসাদুজ্জামান: লেখক, গবেষক, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সম্পাদক, দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার ও পরিচালক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, drkasadbd@gmail.com

নতুন রূপকথার হাতছানি

হাছিনা আক্তার

২০০৮ সালের নির্বাচনি অঙ্গীকারে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই ডিজিটাল বাংলাদেশই বদলে দিয়েছে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির গতিপথ। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা। ২০৪১ সাল সামনে রেখে আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জ এখন স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সমাজের জন্য ডিজিটাল সংযোগ মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই স্মার্ট বাংলাদেশ সহজ করবে মানুষের জীবনযাত্রা, হাতের মুঠোয় থাকবে সব কিছু। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই আসবে সেই রূপকথার মতো দেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। তরুণ প্রজন্ম এখন স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে মূলত বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা স্মার্টলি পাওয়া যাবে। যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রতিটি নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ সুযোগ। এটি বর্তমান সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও স্লোগান– ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা চারভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি এই শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরি বাস্তবে রূপায়ন করা সম্ভব।

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল সারমর্ম– দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকোনমি। অর্থাৎ ইকোনমির সমস্ত কার্যক্রম আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট; ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। আর আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি।

স্মার্ট বাংলাদেশের নির্মাণ শুধু তথ্য ও প্রযুক্তিগত খাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সকল খাতের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হবে। রূপকল্প ২০৪১-এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ২০২১ থেকে ২০৪১ কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করেছে। যা জনগণের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে। অন্যদিকে ২০৪১ সালেই শেষ নয়, ২১০০ সালেও এই বঙ্গীয় বদ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য ডেল্টা প্ল্যান করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোর উত্তম পদক্ষেপগুলো যাচাই করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১' তৈরি করা হয়েছে যার মূল কথা হচ্ছে, আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি), রোবটিক্স, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক

ও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহণ, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, অর্থনীতি, বাণিজ্য, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্ট্রাপ্রেনিয়রশিপ, কমিউনিটিসহ নানা খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা হবে। এই আইসিটি মাস্টারপ্ল্যানে মোট ৪০টি মেগাপ্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে যেসব কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে।

রূপকল্প ২০৪১-এ কিছু কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রূপকল্প ২০৪১-এর নির্দিষ্ট কৌশলগত লক্ষ্য হলো : (১) ২০৩১ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল আর ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার তিন ভাগে নামিয়ে আনা। (২) ২০৩১ সালে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, ২০৪১ সালে উচ্চআয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। (৩) কৃষিতে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (৪) সেবা খাতকে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের সেতু হিসেবে গড়ে তোলা। (৫) নগর সুবিধায় ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের কৌশল গ্রহণ। (৬) দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচারুরূপে জ্বালানি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা। (৭) জলবায়ু অভিঘাত ও অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ থেকে সুরক্ষা পেতে যথাযথ কৌশল প্রণয়ন। (৮) দক্ষতাভিত্তিক সমাজ গঠনে বাংলাদেশকে জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে দেশের ডিজিটালাইজেশন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে হলে স্মার্ট বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ তো শুধু একটি স্লোগান নয়, আগামী দুই যুগ ধরে চলবে এমন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম স্মার্ট বাংলাদেশ। আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। ভবিষ্যতে যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকবে তারাই ভালো কাজ পাবে। যাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকবে না, তারা কাজ হারাবে। তবে সবাই কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে তা মোটেই নয়। অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণও বাড়তে পারে। ভবিষ্যতের এই অদম্য অগ্রযাত্রায় সবাইকে শামিল হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতায় বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে

উন্নত বিশ্বপ্রযুক্তি আজ যে পর্যায়ে এসেছে আমাদের দেশে তার কাজটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে তিন দশক আগে। তারপরও এখন দেশ শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠেনি। সেই বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এখন প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই উদ্যোগ সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া। আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র : উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

হাছিনা আক্তার: পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা, akterhasina90@gmail.com

ভাষা আন্দোলন ও আমাদের দায়

রফিকুর রশীদ

বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন স্বর্ণোজ্জ্বল এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে। বহতা নদীর মতো যে-কোনো ভাষা আপন গতিতে এগিয়ে চলে। তার এই প্রবহমানতা বলা চলে অপ্রতিরোধ্য। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা ধরনের মিলনে-মিশ্রণে ভাষা যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি মর্জিমাফিক জবরদস্তিভাবে বদলে দেওয়ার অশুভ প্রচেষ্টাও ভাষা সব সময় রুখে দাঁড়ায়। জাতির ইতিহাসে ভাষার এই লড়াকু ভূমিকা বাংলা ও বাঙালির জীবনে পেয়েছে আলাদা মাত্রা। সেটা এতটাই বিশিষ্ট যে বাঙালির ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্বসভা স্বীকৃতি দিয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। বাংলা ভাষার এই গৌরব ও মর্যাদার প্রতি, বাঙালির অপরাজেয় সেই লড়াইয়ের স্মৃতির প্রতি আজকে আমরা কতটা সচেতন ও দায়িত্বশীল, সেটা ভেবে দেখা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে বর্তমানে প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়সমূহ নির্ণয় করাও বড়োই প্রয়োজন।

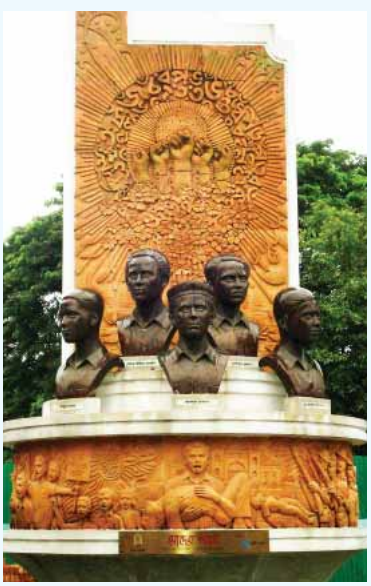

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাঙালির ভাষার লড়াই শুরু হয়েছে অনেক আগে, সেই চর্যাপদের কাল থেকেই। হয়ত বাংলা ভাষা তখনও আজকের এই প্রমিত রূপ লাভ করেনি, সবেমাত্র প্রাকৃত থেকে বেরিয়ে এসে আপন চেহারায় প্রতিভাত হয়ে উঠছে; তবু পণ্ডিতেরা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন জন্মআবিল মাখা সেই ভাষাই ছিল বাংলা ভাষার আদিরূপ। আমাদের ভাষার লড়াই সেই গোড়া থেকেই। পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা এসে জনজীবনে যে নিপীড়ন ও জবরদস্তি করে, তারই পরিণতিতে চর্যাপদ এবং পদকর্তাদের দেশান্তরিত হতে হয়। তাই তো নেপাল থেকে চর্যাপদকে উদ্ধার করতে হয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। মধ্যযুগের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও বসন্তরঞ্জন আবিষ্কার করেন বাঁকুড়ার এক গোয়াল থেকে। এসব ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কতটা বৈরী পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাংলা ভাষাকে টিকে থাকতে হয়েছে। বরং মুসলিম শাসনামলেই কিঞ্চিৎ রাজ আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে জনম দুখিনি বাংলা ভাষা, আরবি, ফারসিসহ বহু বিদেশি শব্দের মিশেল ঘটার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি ঘটেছে বাংলা ভাষার; লোকচক্ষুর অন্তরালে অসংখ্য লোককবি রচনা করেন লোকসাহিত্য। ভাষার নদী হয়ে ওঠে অনেকটা নাব্য। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে আবার সেই প্রতিকূলতা। রাজভাষা ইংরেজি শিখে এদেশেই গড়ে ওঠে দালাল মুৎসুদ্দি শ্রেণি। বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ বিকাশে তারা সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। তারপর পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক ভাষানীতি বাঙালি জাতিকে রাজপথে নামিয়ে আনে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর থেকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হয় বাঙালি, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা তখন থেকেই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাড়িত এবং সৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের সূচনালগ্নেই বাঙালির ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটে। আত্মপরিচয়ের স্বরূপসন্ধানী হয়ে ওঠে বাঙালি। ভাষা আন্দোলন তাই শুরু থেকেই মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাঙালির নিজস্ব ঠিকানা অন্বেষী হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (২২শে ফেব্রুয়ারিও বটে) ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলনের শোকাবহ পরিণতির কথা আমরা বছরের এই বিশেষ দিনটিতে স্মরণ করি, শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন অথবা বিশেষ মোনাজাত করি; এমনই সব আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের ফ্রেমে বন্দি করে আমরা অমর একুশকে জাতীয়ভাবে স্মরণীয় (আন্তর্জাতিকভাবেও বরণীয়) একটি দিবসে পরিণত করেছি। কিন্তু বিশেষ ওই দিবসটির তাৎপর্য অনুধাবনে এবং তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট যত্নবান হতে পেরেছি বলে মনে হয় না। অথচ একুশের সিঁড়ি বেয়েই আমরা মিলেছি

স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং তিরিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে সে সংগ্রামে বিজয় লাভ করেছি। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের পেটের ভেতর থেকে অভ্যুদয় ঘটেছে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের রয়েছে ব্যাপক গণভিত্তি, সাতচল্লিশের দেশভাগের পর এই ভাষা আন্দোলনই সত্যিকারের কথায় সকল শ্রেণির গণমানুষের সম্পৃক্ততায় গণ-আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। সেদিনের এই গণঐক্যই বাঙালিকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়যুক্ত করে, ছেষট্টির ছয় দফার পতাকাতলে সমবেত করে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ঘটায়, সত্তরের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় নিয়ে আসে, মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দেয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গণঐক্যেই বাঙালির আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে। স্বাধীনতার পর এই ইস্পাত-দৃঢ় ঐক্য আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

গভীর পরিতাপের হলেও সত্যি যে ভাষা আন্দোলনের সেই গৌরবময় ইতিহাস একেবারে সহজসরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে তরুণ প্রজন্মের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরাও হয়নি (মোটা মোটা গবেষণা গ্রন্থ অবশ্য লেখা হয়েছে), আবার ভাষা আন্দোলনের প্রবহমান গতির সঙ্গে যোগযুক্ত করাও হয়নি। পূর্বপুরুষের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগাথার সঙ্গে যদি উত্তরপুরুষের পরিচয় নিবিড় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ না হয়, তাহলে বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া গৌরবদীপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে কেমন করে যোগযুক্ত করবে উত্তরপুরুষ? সেই গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাববেই বা কী করে? আর পূর্বপুরুষের কাছে উত্তরপুরুষের যে ঋণ, সেই ঋণ যদি কেউ উপলব্ধি না করে, তাহলে তো ঋণশোধের কোনো দায়-ই বোধ করবে না তারা। মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসও যেমন সম্পূর্ণভাবে অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি, তেমনি ভাষা আন্দোলনেরও আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা হয়নি বললেই চলে। জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা করে এ কাজটিতে হাত দেওয়া খুবই জরুরি। দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে এবং মাতৃভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কী এবং কতখানি গভীর, সেইটা ধরিয়ে দেওয়া বড়োই প্রয়োজন। সম্পর্কের সুতোটা চিনতে পারলেই বিশেষ নৈকট্য অনুভব করতে শিখবে মানুষ। অদৃশ্য সেই সুতোয় টান পড়লেই তাদের অন্তরে ভালোবাসা জেগে উঠবে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি, মাতৃভূমির জেগে ওঠার ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের নির্মাতা মানুষের প্রতি। আর ভালোবাসলে তবেই আসে দায়িত্ব কর্তব্যের কথা, আসে পূর্বপুরুষের ঋণশোধের কথা।

এই তো সেদিন ফেব্রুয়ারির পহেলা তারিখে বাংলা একাডেমিতে এসে অমর একুশের বইমেলা উদ্বোধনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সানন্দে জানালেন উচ্চআদালতের রায় বাংলায় অনুবাদ করে এরই মধ্যে সর্বজনবোধগম্যভাবে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ উদ্যোগ, মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সফল হবে এর মাধ্যমে। এ রকম আরও অনেক উদ্যোগ এখনও গ্রহণের অপেক্ষায় আছে। শুধু সরকারপ্রধানের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা নয়, উদ্যোগ নিতে হবে সবাইকে। যেহেতু ভাষা আন্দোলন ছিল গণমানুষের অংশগ্রহণে ধন্য গণ-আন্দোলন, তাই ভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাস্তবায়নে আমাদের সবারই দায় আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে না।

রফিকুর রশীদ: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক, rafiqurashid57@gmail.com

ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক

টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মতো 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক ২০২৩' প্রদান করা হয়েছে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৯শে জানুয়ারি ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ১২টি ক্ষেত্রে ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এবছর ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদকে ভূষিত করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার তাদের মধ্যে এ পদক বিতরণ করেন। ১২টি ক্ষেত্রে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক নেট লিমিটেড, বিভাগীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মিলিনিয়াম কম্পিউটার্স অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, জেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিশোরগঞ্জ অনলাইন নেটওয়ার্ক, উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এমএসএস এন্টারপ্রাইজ, শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বিজয় ডিজিটাল', ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা সেবা প্রদানে অবদান রাখার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরের 'সুরক্ষা টিম', টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবদান রাখার জন্য ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য নগদ লিমিটেড ডিজিটাল, বাংলাদেশ বিনির্মাণে কন্টাক্ট সেন্টারের (BPO) বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিফোটেক, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট শিল্পে অবদান (ব্যক্তি পর্যায়ে) বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট শিল্পে অবদান (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি), ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ অবদান (ব্যক্তি পর্যায়ে) ইকবাল বাহার জাহিদ, ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ অবদান (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে) বিটিআরসি, ডিজিটাল নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদানের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর। এছাড়া ডিজিটাল/টেলিযোগাযোগ সংযুক্তিতে অবদানের জন্য বিটিসিএল, টেলিকম শিল্পের বিকাশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের সংগঠন হিসেবে টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্কস, বাংলাদেশ টেলিকম শিল্পের বিকাশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের (একক) কম্পিউটার জগৎ, ইমার্জিং টেকনোলজি (আইওটি ও ওটিটি) বিকাশে বিশেষ অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্বীকৃতিস্বরূপ ডেটা সফট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাস্যাম্বলি ইনক লিমিটেডকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক ২০২৩-এ ভূষিত করা হয়।

পদক বিতরণকালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির বিকাশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ পদক প্রদান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন: রাইসা জামান

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান কতটুকু তা জানার আগে একুশের ঐতিহাসিক ঘটনার দীর্ঘ ইতিহাসটির কিছু জেনে নেই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কতিপয় রাজকর্মচারীর বেইমানির কারণে পরাজিত হয়। মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজরা এদেশের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেয়। এরপর থেকে প্রায় দুইশো বছর বাঙালিরা ইংরেজদের শাসনে থাকে। এর মাঝে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তিতুমীর, ফকির মজনু শাহ, রজব আলী ও ক্ষুদিরামের মতো অনেক সিংহপুরুষ জন্ম নিয়েছে এই মাটিতে। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বদেশের জন্য লড়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে একটি বৈষম্য রচনা করে যায়। যাতে তারা মনে মনে বিরোধীভাব পোষণ করতে পারে। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই ভিত্তিকে সূত্র ধরে ভারতবর্ষকে ভেঙে দুটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হলো ১৯৪৭ সালে। বাংলা ভাষীর পূর্ব বাংলা আর বারোশো মাইল দূরের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও উর্দুভাষীদের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। অথচ দেশভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। পুরো রাষ্ট্রের শাসনভারও তাদের হাতে তুলে নেয়। তারা বাঙালিদের ওপর শুরু করে শোষণ ও বঞ্চনা। তারা প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালি জাতির বাংলা ভাষার ওপর।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় করাচিতে। প্রথম দিনেই পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কুমিল্লার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ প্রস্তাবের সংশোধনী আনেন। তিনি বাংলা ভাষাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার প্রস্তাব করেন। তাঁর দাবি বাতিল হয়ে যায়। এ খবর ঢাকায় পৌঁছলে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা বিক্ষুব্ধ হন।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আলোচনা চলে। ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯২১ নালে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের কাছে একই প্রস্তাব দেন। ১৯৩৭ সালে *দৈনিক আজাদ* 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকায় বাংলাকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করা হয়।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের জন্ম। প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাবেশ শেষে বের হওয়া মিছিল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, সামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, অলি আহাদসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে না– এই ঘটনার খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাঙালি যুবসমাজ বুঝতে পারল যে, বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। তখনকার উদীয়মান রাজনীতিবিদ এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নবগঠিত ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশ এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়, যাতে শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়। এই দিনে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং সারা বাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ও তমদ্দুন মজলিশের প্রধান আবুল কাশেমসহ সংগ্রাম পরিষদের শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন জেলা সফর করে ছাত্র-জনতাকে দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ১১ই মার্চ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র-যুবক গ্রেপ্তার হন। আন্দোলন তীব্র হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ততদিনে বাঙালি ছাত্র-যুবসমাজের প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়েছে। ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু, সামসুল হকসহ কয়েকজন নেতা জেল থেকে মুক্তি

পান। তাঁদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় র‍্যালি হয়, এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন।

আন্দোলনের তীব্রতায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র পূর্ব পাকিস্তান সফর চূড়ান্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এতে তাঁকে আবার আটক করা হয়। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা পরিশোধে বিরত থাকেন। এ সময়েই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এর পর পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ রেসকোর্স মাঠে এক জনসভায় বলেন, 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। এর তিনদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও একই ঘোষণা দিলেন। ছাত্ররা তার সামনেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ছাত্র-জনতা একের পর এক প্রতিবাদসভা করে বাঙালির সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে তোলে। আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। এ সময় পাকিস্তানি শাসকরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত ছাত্র-যুবককে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু, সামসুল হক, মহিউদ্দিন আহমেদসহ অনেক ছাত্র-যুব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে।

২৩শে জুন সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে এই দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম-সচিব নির্বাচিত করা হয়। জুনের শেষদিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে যোগ দেন শেখ মুজিব। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগে তাঁকে সাময়িকভাবে আটক করা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। এরপর ভাসানীর সাথে মিলে লিয়াকত আলী খানের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের চেষ্টা করায় ভাসানী এবং শেখ মুজিবকে আটক করা হয়।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। এসময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমউদ্দীন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় জিন্নাহ'র কথারই পুনরুক্তি করে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' নাজিমউদ্দীনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদসভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে প্রতিবাদসভা, বিক্ষোভ ও হরতালের ডাক দেয়।

বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। কিন্তু জেলে থেকেই তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। জেল থেকে নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু অবদান রাখেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতেই ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙেই মিছিল করে। ধর্মঘট সফল করে। আইনশৃঙ্খলাবাহিনী মিছিলের ওপর গুলি বর্ষণ করে। রফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ অনেকেই এই গুলি বর্ষণে মারা যায়। তাঁদের লাশ ঢাকা মেডিকেল

ভাষার দাবিতে মিছিলে আহত সহযোদ্ধার পাশে বঙ্গবন্ধু

কলেজের সামনে পড়ে থাকে। বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। হাসপাতালে আহতদের ভিড়। এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ২২শে ফেব্রুয়ারিও ছাত্র-যুব-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন-বিক্ষোভ করে। শফিউরসহ কয়েকজন মারা যায়। আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

একই সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন করেছিলেন। তিনি জেলে থেকেই কৌশলে আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শুরু থেকেই বাঙালি শিক্ষিত নারীরা ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান সরকার। সরকার বাঙালির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই একুশে ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি হয়। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার অধিকার ফিরে পায়। বাঙালি জাতি তার অন্যান্য অধিকার রক্ষায় আন্দোলনের প্রেরণা পায়। বাঙালি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সেদিন প্রতিবাদী, সাহসী ও সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল। বুকের রক্ত দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

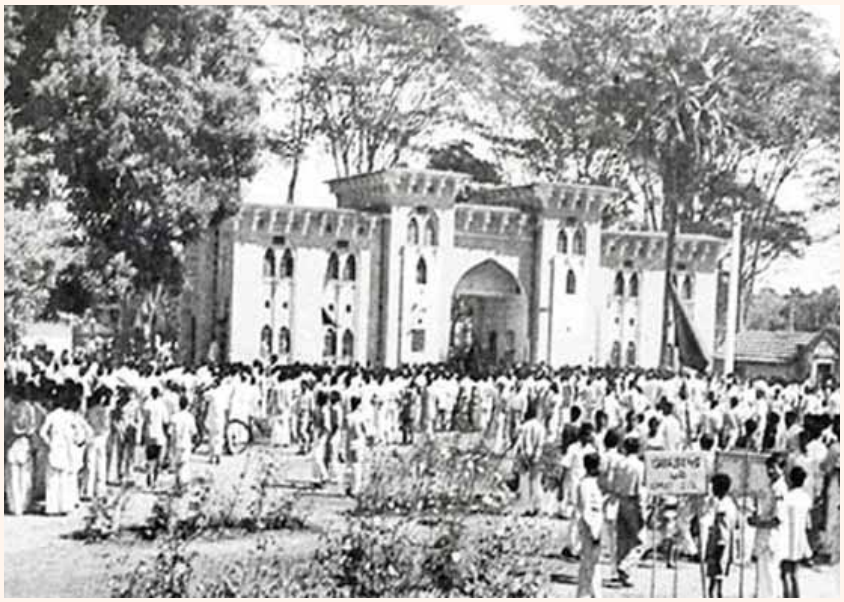

রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি এবং বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালির অধিকার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তিনি রেখেছেন অসামান্য অবদান। এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার, আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রামে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ঠিক তেমনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মহান ভাষা আন্দোলনের ভাষা সৈনিক অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের লিখিত বক্তব্য ও সাক্ষ্য এবং *'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা, ভূমিকা ও অবদানের তথ্য জানা যায়।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন– 'আর পূর্ব বাংলা নয়, আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, জনগণের পক্ষে আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে বাঙালি জাতির এ আবাসভূমির নাম বাংলাদেশ'–এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি এদেশের নামকরণ করেন। প্রথমে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ফিরিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানকেও বাংলাদেশ নামকরণ করে একটি স্বাধীন আবাসভূমি বাঙালিদের উপহার দেন তিনি। তিনি যা বলতেন তাই তিনি করিয়ে দেখিয়ে দিতেন। তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অসামান্য কৃতিত্বের।

ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন করার জন্য আবেদন জানানো হয়। শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনেসকোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইউনেসকো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার অনুমতি দান করে। কানাডাও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই থেকে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ অমর একুশের দিনকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা সেই ভাষা আন্দোলনের দিনটিকে বিশ্বের ১৯৩টি দেশে পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করার স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, জেলা সংবাদদাতা, বাংলাদেশ বেতার

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ স্মরণীয় করে রাখতে ডাকটিকিট অবমুক্ত

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ঐতিহাসিক জয় দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের কৃতিত্বের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড প্রকাশ করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে এ উপলক্ষে প্রকাশিত ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড প্রকাশ করেন।

এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এ অসামান্য অর্জন এবং বিস্ময়কর ক্রীড়ানৈপুণ্য সমগ্র জাতিকে সম্মানিত করেছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আগামী দিনগুলোতে বড়ো সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এ অর্জন দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে অনুপ্রাণিত করবে বলে মন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সে দিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের কাছে এটি এক ঐতিহাসিক সূচনা বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৩'-এর উদ্বোধন করেন –পিআইডি

একুশের বইমেলা

বিশ বারের উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রহিম আব্দুর রহিম

ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার মতো বিরল ঘটনা এবং অক্ষয় ইতিহাস সৃষ্টিকারী একমাত্র জাতি বাঙালি। এ জাতিই তার মায়ের ভাষা রক্ষায় অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা-বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সকল সার্থকতা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সাত হাজার ভাষার মধ্যে সুমিষ্ট ভাষা 'বাংলা' বিশ্বের সর্বত্রই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ভাষা নিয়ে জরিপ চালালে তাতে মিষ্ট ভাষা হিসেবে সবার ওপরে উঠে আসে বাঙালি জাতির রক্তদানের রক্ষিত আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের রক্তঝরা পথই আমাদের স্বাধীনতা, বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, কর্মে-ধর্মে সবর্ত্রই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উন্নয়ন ছোঁয়ায় উজ্জীবিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধারে একজন লেখক, পাঠক, সমালোচক এবং দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব। এবার মহান একুশের বই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেখ হাসিনার সময়ানুবর্তিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল ভাষা শহিদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং ১৫ই আগস্ট নিহত সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য শুরু করেন। দেশের রাজনীতি, উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সরকার আমলের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আমাদের সাহিত্যের আলাদা একটা মাধুর্য আছে। আমাদের দেশের নদীনালা, খালবিল, বন, পাখির ডাক সব কিছুর মধ্যেই আলাদা একটা সুর আছে, ছন্দ আছে। বিদেশিরা আমাদের ভাষা সম্পর্কে আরও জানতে পারুক সেটাই আমরা চাই।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'জাতির পিতা একবার আন্তর্জাতিক সাহিত্য মেলার আয়োজন করেছিলেন। আমি মনে করি, এরকম বিশেষ সাহিত্য মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নেবে বাংলা একাডেমি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগতাড়িত স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'যখন থেকে বইমেলা শুরু তখন থেকে সারাদিন এখানে ঘুর ঘুর করতাম। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পায়ে শিকল পড়ে যায়। নিয়মের মধ্যে আসতে হয়। আগের মতো এখন সেই স্বাধীনতাটা পাচ্ছি না। সেটা আর উপভোগ করতে পারি না।' বাংলা একাডেমির বটতলায় প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'এই বটতলায় অনেক সময় কাটিয়েছি আমরা। কোভিডের কারণে দুই বছর সরাসরি বইমেলায় আসতে পারিনি। আজকে দীর্ঘদিন পর আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। যদিও আগের মতো সেই স্বাধীনতা পাচ্ছি না। তারপরও বাংলা একাডেমিতে আসতে পারলাম এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। এই প্রাঙ্গণে আমার সবসময় পদচারণা ছিল। আমি সবসময় বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি ব্যবহার করতাম।' তাঁর এই ভাষণে বুঝতে বাকি থাকে না তিনি শিক্ষার্থী থাকাকালে একজন সুপাঠক ছিলেন। যাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল বই এবং সহপাঠীদের সাথে। শেখ হাসিনা শৈশব-কৈশোর পার করেছেন মাটি আর মানুষের সাথে। যে কারণেই তিনি খাঁটি দেশপ্রেমিক একজন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছেন। শেখ হাসিনার ভাষা প্রেম এবং মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটান তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়েই। তিনি বলেন, '২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। এর ফলে আমাদের বাড়তি দায়িত্ব এসে গেছে। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার বিস্তার বাড়াতে হবে। এর জন্য আরও বেশি করে অনুবাদ করতে হবে। এখন বছরে একটা, দুইটা এই অনুবাদ হয়। এটা বাড়াতে হবে। মানসম্মত ইংরেজিতে বিভিন্ন ভাষার এই অনুবাদ হতে হবে।' শেখ হাসিনা তৃণমূল পর্যায় থেকে কবি-সাহিত্যিকদের মূলধারায়

স্থান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, 'বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে সাহিত্য মেলার আয়োজন করতে পারেন। জেলায়, উপজেলায় বইমেলার আয়োজন করতে পারেন। তরুণদের সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা এবং খেলাধুলায় আগ্রহী করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি জাতিসংঘে যতবার ভাষণ দিয়েছি, বাংলায় ভাষণ দিয়েছি।' সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেক দেশেই বইমেলা হয়। যেখানে আমাদের পক্ষ থেকেও যেন অংশগ্রহণ থাকে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যত বেশি মানুষ জানতে পারবে তত ভালো।' তিনি বলেন, 'আদালতে বাংলায় রায় দেওয়া শুরু হয়েছে। সব ক্ষেত্রে আমাদের এই উদ্যোগ নেওয়া

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৩'-এর উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন –পিআইডি

উচিত। অর্থনৈতিক চিন্তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চিন্তাও করা উচিত। ১৯৪৮ সালে সংগ্রাম শুরু, ভাষার অধিকার থেকেই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।' শেখ হাসিনা বলেন, '২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতার এই সময়ে অর্থনীতিতে, সাহিত্যচর্চায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। শিশু সাহিত্য আরও দরকার। আরও আকর্ষণীয় বই দরকার।' 'পড়ো বই, গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শিরোনামের একুশের বইমেলার উদ্বোধনকালের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'আমার মাটি আছে, মানুষ আছে, আমি এই মাটি-মানুষ দিয়েই দেশ গড়ব'– এই অমর বাণীটিও উচ্চারণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এও বলেন যে, 'ড্রাগ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সাহিত্য ও খেলাধুলা চর্চা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যাঙ্গনে প্রযুক্তির ব্যবহার করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নিজ হাতে বই পড়ার মধ্যে যে সাহিত্য স্বাদ, তা কিন্তু ফোনে পাওয়া যায় না।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনে যারা আছেন তাদের উদ্দেশ করে বলেন, 'তারা যেন অবস্থানরত স্ব-স্ব দেশের সাহিত্য মেলায় বাংলা সাহিত্যের স্থান করে দেওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।' বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, সচিব মো. আবুল মনছুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহাম্মদ নূরুল হুদা। কবি নূরুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'অমর একুশে বইমেলায় বিশ বারের মতো উদ্বোধন করলেন আজকের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।' শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আরিফ হোসেন ছোটন।

উল্লেখ্য, ১লা ফেব্রুয়ারি ভাষার মাসের প্রথম দিনে মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ১৪৯টি রায় ও আদেশ বাংলায় লেখা হয়েছে। এর মধ্যে আদালতের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ১৪৫টি মামলার সবগুলোতে বাংলায় আদেশ দিয়েছেন। এছাড়াও বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ একটি ফৌজদারি রিভিশন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে বাংলায় রায় দিয়েছেন। একই দিনে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ উদ্বোধন করা হয়েছে। ঐদিন জাতীয় কবিতা পরিষদ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'বাংলার স্বাধীনতা আমার কবিতা' শিরোনামে জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২৩-এর উদ্বোধন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে। ৩৫তম জাতীয় কবিতা উৎসবের উদ্বোধন করেন কবি আসাদ চৌধুরী। কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উৎসবে বক্তব্য রাখেন উৎসব আহ্বায়ক কবি শিহাব সরকার, সাধারণ সম্পাদক কবি তারিক সুজাত, শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কবি ও প্রাবন্ধিক আমিনুর রহমান সুলতান, ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কবি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উৎসবে দেশ-বিদেশের প্রায় ৩ শতাধিক কবি ও প্রাবন্ধিকরা অংশগ্রহণ করেন। বিদেশি কবিদের মধ্যে দিল্লি থেকে আসা কবি অরুন কমল, মুম্বাই থেকে কবি হেমন্ত দিভাত, কলকাতা থেকে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, কবি কাজল চক্রবর্তী, কবি সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য এবং আবৃত্তিশিল্পী সৌমিত্র মিত্র, আসাম থেকে কবি অনুভব তুলসি, ত্রিপুরা থেকে কবি রাতুল দেব বর্মন, নেপাল থেকে কবি ইন্দু থারু, অস্টিয়া থেকে কবি ওয়ালি রি, ইরান থেকে কবি বি মাজিদ পুইয়ান উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলার উদ্বোধন শেষে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ৭টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত *শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলি-১*, *কারাগারের রোজনামচা পাঠ বিশ্লেষণ*, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ বিশ্লেষণ* ও *আমার দেখা নয়াচীন পাঠ বিশ্লেষণ*, রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রচিত *আমার জীবন নীতি*, *আমার রাজনীতি* এবং *জেলা সাহিত্য মেলা ২০২২* (প্রথম খণ্ড)। মোড়ক উন্মোচনের পূর্বে বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৫ জন কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকদের মাঝে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০২২) তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, কবিতায় ফারুক মাহমুদ ও তারিক সুজাত, কথা সাহিত্যে তাপস মজুমদার ও পারভেজ হোসেন, প্রবন্ধ/গবেষণায় মাসুদুজ্জামান, অনুবাদে আলম খোরশেদ, নাটকে মিলন কান্তি দে ও ফরিদ আহমেদ দুলাল, শিশুসাহিত্যে ধ্রুব এষ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় মুহাম্মদ শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় শুভাষ সিংহ রায়, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞানে মোকারম হোসেন, আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণ কাহিনিতে ইকতিয়ার চৌধুরী এবং ফোকলোরে আব্দুল খালেক ও মুহাম্মদ আব্দুল জলিল।

অমর একুশে বইমেলা (২০২৩)-এ এবার ৬০১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯০১টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরমধ্যে বাংলা একাডেমি মাঠে ১১২টি প্রতিষ্ঠানকে ১৬৫টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৪৮৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৩৬টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে ১৫৩টি স্টল বরাদ্দ পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থাপিত প্রায় স্টলগুলোই ঘুরে-ফিরে দেখেছেন এবং বইও ক্রয় করেছেন।

এবারের অমর একুশে বইমেলায় বাংলা একাডেমির হিসাবে এবছর বিক্রি হয়েছে প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। মেলার শেষ দিনে বই এসেছে ২৬৭টি। এবছর বইমেলায় নতুন বই এসেছে ৩ হাজার ৭৩০টি। তবে এ হিসাব বাংলা একাডেমির তথ্যকেন্দ্রে জমা পড়া বইয়ের। এর বাইরেও মেলায় নতুন বই প্রকাশ হয়েছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী দিনে বাংলা একাডেমির জনসংযোগ উপবিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এবছর সর্বোচ্চ বই প্রকাশিত হয়েছে কবিতার। যা সংখ্যার হিসাবে ১ হাজার ২৪৭টি। এ ছাড়া এবছর গল্প ৪৬৬, উপন্যাস ৫০৩টি, প্রবন্ধ ১৯৭টি, গবেষণা ৭৫, ছড়া ৮১, শিশুতোষ ৭৯টি, জীবনী ১২৮, রচনাবলি ৪৩, মুক্তিযুদ্ধ ৮০, নাটক ৫৪, বিজ্ঞান ৫১, ভ্রমণ ৬৭, ইতিহাস ৮৭, রাজনীতি ৩৩, স্বাস্থ্য ৩৩, রম্য ২২, ধর্মীয় ৫৫, অনুবাদ ৬৯, অভিধান ১৩, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ৬৭, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ৩৫ এবং বিবিধ বিষয়ে বই এসেছে ২৬৬টি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বইমেলার মূলমঞ্চে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বইমেলার সদস্য-সচিব ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ এইচ এম লোকমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানে ক্যারোলিন রাইট এবং জসিম মল্লিককে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ এবং কবি মোহাম্মদ রফিককে কবি জসীমউদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিকসংখ্যক বই প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনীকে চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০২৩, শৈল্পিক ও গুণমান বিচারে সেরা বই বিভাগে আহমদ রফিক রচিত *বিচ্ছিন্ন ভাবনা* প্রকাশের জন্য জার্নিম্যান বুক্স, মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ রচিত বাংলা একাডেমি আমার বাংলা একাডেমি বইয়ের জন্য ঐতিহ্য এবং হাবিবুর রহমান রচিত *ঠার*: বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রকাশের জন্য পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সকে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩, শিশুতোষ বইয়ের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ময়ূরপঙ্খিকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালের অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুথিনিলয় (প্যাভিলিয়ন), নবান্ন প্রকাশনীকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়।

রহিম আব্দুর রহিম: শিক্ষক, কলামিস্ট, গবেষক, শিশু সংগঠক ও নাট্যকার, bskt1967@gmail.com

বাণিজ্য মেলায় ৩০০ কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, এবারের ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। অংশগ্রহণকারী বেড়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। মেলায় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লাখ দর্শনার্থী এসেছেন। মেলায় কেনা-বেচা হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। স্পট রপ্তানি আদেশ মিলেছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত পূর্বাচল স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ৩১শে জানুয়ারি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিশেষ অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন। রপ্তানি ক্ষেত্রে বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিগত বছর ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে প্রকৃত রপ্তানি হয়েছিল ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয় ১০টি সেরা প্যাভিলিয়ন ও স্টলকে, দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় ১৩টি প্যাভিলিয়ন এবং স্টলকে, তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় ১১টি প্যাভিলিয়ন ও স্টলকে। এছাড়া, শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে, বেস্ট ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে, বেস্ট ফার্নিচার উৎপাদনকারী বা রপ্তানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে এবং ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা হিসেবে ২টি প্রতিষ্ঠানকে ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক এবং বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এসব ট্রফি বিতরণ করেন।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

আমার বাংলা ভাষা

শ্যামল দত্ত

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়
মমতা নামের পুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে শিউলি-শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদন মোহন তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি, অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সঙ্কেতে।...

(*বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা*/শামসুর রাহমান)

'বাংলা' পৃথিবীর সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ এক ভাষা। এ ভাষার রয়েছে অনেক মূল্যবান ঐতিহ্য ও নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মরমি সাধক লালনশাহ্, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বেগম রোকেয়া, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্‌দীনসহ অসংখ্য মনীষীর স্পর্শে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি মধুসূদন দত্ত ছিলেন অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই মহাকবি হওয়ার এবং বিলাতে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ইংরেজিতে লেখালেখি শুরুও করেছিলেন। তাঁর *দ্য ক্যাপটিভ লেডি* গ্রন্থটি পড়ে কবি ও ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) অভিভূত হয়েছিলেন। ভারতে বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষায় বেথুন সাহেবের অবদান ছিল অসাধারণ। ওদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন ইংরেজিতে মহাকাব্য লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। বেথুন সাহেব মাইকেলকে চিঠি লিখে দেশে ফিরে আসতে এবং বাংলায় কাব্যরচনা করতে পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে কবি মধুসূদন নিজের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। মাতৃভাষার প্রতি গভীর আবেগে তিনি লেখেন–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।...

(*বঙ্গভাষা*/মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে সবুজ বদ্বীপ অঞ্চলজুড়ে অপরূপ সুন্দর এক দেশ বাংলাদেশ। আবহমানকাল থেকে এ মাটির মানুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। তারা বিদেশি শাসন-শোষণে নির্যাতিত হয়েছে বারবার, কিন্তু মাথা নত করেনি কোনোদিন। স্বাধিকার আদায়ের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় আসে ১৯৪৭। ভারত বিভাগের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও বাঙালি তার অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। প্রথম আঘাত আসে ভাষার উপর। ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন, 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।' তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব দিলেন, বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু বাঙালির সব যুক্তি এবং দাবি অগ্রাহ্য হলো।

১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ, সারা দেশে পালিত হলো প্রথম রাষ্ট্রভাষা দিবস। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু ১৯৪৮-এর ২১শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং এর তিনদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ঘোষণা দিলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কার্জন হলে উপস্থিত অনেক বাঙালি ছাত্র সেদিন 'নো-নো' স্লোগানে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেছিলেন।

এরপর ১৯৫২-র ২৬ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী হয়ে খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় এসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি দম্ভের সাথে ঘোষণা দিয়ে বলেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ৩১ জানুয়ারি, প্রতিবাদী ছাত্রনেতারা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে দীর্ঘ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। প্রশাসনও এ সময় নড়ে চড়ে বসে। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু স্বৈরশাসকের আইন অমান্য করে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এসে জড়ো হন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে তারা খণ্ড-খণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে মিছিল করে নেমে আসেন রাজপথে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের নির্দেশে ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালানো হয়। নিহত হন আবদুল জব্বার, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুস সালাম, শফিউর রহমান, আবুল বরকত। ছাত্রদের এই ন্যায়সংগত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কারাগারে আটক তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং জননেতা মওলানা হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘ ১২ দিন অনশন পালন করেন।

অমর একুশের স্মৃতির স্মারক আমাদের শহিদমিনার। এই মিনারের

সাথে মিশে আছে বাঙালির অনেক রক্ত, অনেক অশ্রুজল। মিশে আছে তারুণ্যের গৌরবগাথা। শহিদমিনার যেন এক অশ্রুসজল গরবিনী মায়ের প্রতীক। মা যেন তার সাহসী সন্তানদের গর্বে গর্বিত, শ্রদ্ধাবনত। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষার দাবিতে নিহত ছাত্রদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহিদমিনারটি স্বৈরশাসকের নির্দেশে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ক্ষোভ থেকে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছিলেন কবিতা–

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু,
আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটকা ধুলায় চূর্ণ যে পদ-প্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাঁপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক! ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার।

(স্মৃতিস্তম্ভ, আলাউদ্দিন আল আজাদ)

অমর একুশের চেতনা থেকেই বাঙালি তার অধিকার সম্পর্কে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় জাতি। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই মুক্তিকামী জাতি স্বাধীনতার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। অনেক ত্যাগ আর সংগ্রামের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আসে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজ পতাকায় লেখা হয় বাংলা আর বাঙালির নাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা ভাষাকে যিনি আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, তিনি বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ অধিবেশনে সর্বপ্রথম তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় বাংলায় ভাষণ। বিশ্ব ফোরামে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলেছিলেন–

> শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

'অমর একুশে'-র বিশ্বস্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা দীর্ঘদিনের। ১৯৯২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে 'বাঙালির চেতনা মঞ্চ' ও 'মুক্তধারা ফাউন্ডেশন' নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অস্থায়ী শহিদমিনার নির্মাণ করেছে। কানাডায় বসবাসরত রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই চেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেসকোর প্যারিস অধিবেশনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয় বাঙালির 'অমর একুশে'।

এদিকে ২০০২ সালে পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ সিয়েরা লিওন অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার নাম ঘোষণা করে। বাংলাদেশের পর এটিই একমাত্র দেশ, যেখানে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক বা সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিয়েরা লিওন। কিন্তু এ দুই দেশের সম্পর্ক এতটাই গভীর ও আন্তরিক যে, এদেশের ভাষাকে আফ্রিকার দেশটি নিজেদের ভাষা করে নিয়েছে। ১৯৯১-২০০২ সাল পর্যন্ত দেশটি গৃহযুদ্ধের অভিশাপে বিধ্বস্ত হয়েছে। সে সময় সিয়েরা লিওনে শান্তি ফেরাতে জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিপুল পরিমাণ শান্তি বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করা হয় দেশটিতে। আর এই বাহিনীর একটি বড়ো অংশজুড়ে ছিল বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর সদস্য। তারা সিয়েরা লিওনের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশটিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এজন্য সিয়েরা লিওনের সরকার বাংলাদেশি সেনা সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ। দেশটির প্রেসিডেন্ট আহমাদ তেজান কাব্বাহ্ সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশি সেনা সদস্যদের ভূমিকাকে চিরস্মরণীয় রাখতে বাংলা ভাষাকে সে দেশের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের নামে সেখানকার রাস্তারও নামকরণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন শুরু করে। ২০১০ সালের ২১শে অক্টোবর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জাতিসংঘ প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস' হিসেবে পালন করবে। ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্য বিষয়ক কমিটিতে সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে।

'অমর একুশে'-র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পর ইউনেসকোর সহায়তায় ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাতৃভাষা, ভাষার বৈচিত্র্য এবং ভাষার বহুমাত্রিক গবেষণা এই ইনস্টিটিউটের অন্যতম লক্ষ্য। ইউনেসকোর দ্বিতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্প্রতি এই ইনস্টিটিউট স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত 'অমর একুশে' আজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আপন মাতৃ ভাষার প্রতি মর্যাদাশীল করেছে। সবাই আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শিখেছে–

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা।

১৯৫২-র অমর একুশে আজ শুধু একটি আন্দোলনের নাম নয়, এক অহংকারের প্রতীক। জাপান, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বহু দেশে নির্মাণ করা হয়েছে একুশের স্থায়ী-অস্থায়ী শহিদমিনার অথবা স্মৃতিস্তম্ভ। পাকিস্তানের প্রগতিশীল জনগণও প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। বাঙালি এখন তার মাতৃভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদায় দেখতে চায়। 'অমর একুশে'-র যে প্রেরণা জাতিকে একদিন আপন ঐতিহ্য রক্ষায় মাথা উঁচু রাখার সাহস জুগিয়েছে, সেই প্রেরণায় উজ্জীবিত জাতি এবার তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

শ্যামল দত্ত : লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

গ্রন্থ পাঠ

শওকত জাহান

মানুষ কখনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একা বাস করতে পারে না। সভ্যতার সূচনালগ্নে মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। কর্মময় জীবনে ক্লান্ত মানুষ অন্যের সাহচর্য পেলে সে নতুন করে উজ্জীবিত হয়। এভাবেই গড়ে উঠল পরিবার, ক্রমে গঠিত হলো সমাজ। কিন্তু মানুষ সর্বদা অন্যের সঙ্গ লাভে সক্ষম নাও হতে পারে। একাকিত্বের যাতনায় তখন সে অন্য কোনো কিছুর সন্ধান করল। পেয়ে গেল সে পরম এক কাঙ্ক্ষিত বস্তুর, এক নতুন সঙ্গীর। আর সেটি হলো পুস্তক।

সভ্যতার আদিতে পাথরে খোদাই করে নিজের চিন্তাধারাকে স্থায়ী করতে চেয়েছিল। কিন্তু কালের করাল গ্রাস একে স্থায়িত্ব দেয়নি। প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ প্রস্তরের লিপিকেও দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। অনেক সময় পাঠোদ্ধার করাও এক কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ গাছের পাতায় নিজেদের চিন্তাধারাকে স্থায়িত্বদানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেটিতেও স্থায়ী করা যায়নি। ভূর্জপত্রের লিখন সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেল। মিশরের প্যাপিরাসও এক সময় লুপ্ত হলো।

মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মানুষ নিজের ঘরেই পেল তার আত্মার আত্মীয়কে কাছের-দূরের– এক কথায় বিশ্বমানব সাহচর্য পেল বইয়ের মাধ্যমে। বই মানবজীবনে এক বিশাল আনন্দের দুয়ার খুলে দিলো। মানুষ শুধু তার বর্তমানকে নিয়েই সুখী হতে পারল না আর ভবিষ্যৎকেও সে দেখতে পায় না। কিন্তু বইয়ের মাধ্যমে অতীতের মানুষের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গেল। এভাবেই গ্রন্থই একমাত্র অতীতের সাথি হলো এবং বর্তমানের সঙ্গে এক বন্ধন তৈরি করল। মানুষ জীবনে আনন্দের মূল লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। আনন্দের জীবনে যখন সুখ এক সময় মিলিয়ে যায়, মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। তখন সে খুঁজে পেল নির্মল এক আনন্দের সন্ধান বইয়ের পাতায়। বইয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক পরিশীলিত আনন্দ। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, 'হে খোদা আমাকে দীর্ঘজীবী করুন যেন আরও পড়তে পারি'।

মানব সভ্যতার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে সম্মুখে অগ্রসরমান, তবে লক্ষ করা গেছে কোনো একটি যুগও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সংশোধন করে সে গড়ে তোলে বর্তমানের ইমারত, রচনা করে এক নতুন সৌধ। আবার সে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করে ভবিষ্যতের ভিত। তাই ভূত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ–এদের মধ্যে সেতুবন্ধ রূপে কাজ করে গ্রন্থ। যা প্রতিটি কালেরই মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানুষ ধ্যান-ধারণার বাহক হিসেবে ধারণ করে এগিয়ে চলছে।

অজানার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুর্বার স্পৃহা মানুষের এক চিরন্তন আকুতি। সেই আগ্রহ থেকেই মানুষ দেশ ভ্রমণ করে। পৃথিবীর কোথাও দুর্গম পাহাড়, কোথাও সীমাহীন পারাবার, কোথাও ঊষর মরুভূমি। এই বিচিত্র পরিবেশে সবার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন শারীরিক, মানসিক শক্তি, যথেষ্ট বিত্ত। এই চিত্ত ও বিত্তের সম্মিলন সবসময় ঘটে না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কোনো সীমারেখা থাকে না। মানুষ তখন বই পড়ে সারা বিশ্ব দর্শনের সুযোগ লাভ করে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও আমরা তাঁর আক্ষেপের সুর শুনতে পাই–

বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে–

পুস্তক পাঠ করেই মানুষের জ্ঞানপিপাসা মিটে এবং একইসঙ্গে বেড়েও যায়। এছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। পুস্তকে লিপিবদ্ধ অতীতকালের পণ্ডিতদের দেখানো পথ অনুসরণ করে বর্তমান প্রজন্ম এগিয়ে যায়। পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও আনন্দের পাঠাগার সম্বন্ধে কবিগুরু বলেন– 'মহাসাগরের শত বৎসরের কল্লোলকে যদি কেউ এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমন্ত শিশুর মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত।'

ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বই মানুষকে দান করে নির্মল আনন্দ, জীবনবোধের শিক্ষা ও অপরিসীম জ্ঞান। যে-কোনো পাঠকই যখন বইয়ের মাঝে ডুব দেয়, তখন সে নিজেরই অজান্তে জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বই মানুষের জীবনে অদৃশ্য শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে তাকে গোপনে নিভৃতে শিক্ষিত ও আধুনিকমনস্ক করে তোলে। তাই লক্ষ করা গেছে অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ত লাভ করার সুযোগ পাননি, কিন্তু বই

পড়ার মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি তথা সমাজের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং নিজেকে অনুকূল-প্রতিকূল সব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শিখে।

ফটোফিচার: শফিউর ইসলাম

কর্মক্লান্ত মানুষ অবকাশ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অবকাশও দীর্ঘায়িত হয়ে গেলে সেটি তার জন্য বিরক্তিকর হয়। তখন সে অবস্থায় একখানা বইয়ের মতো সুন্দর সঙ্গী আর হতে পারে না। একজনের নির্ভেজাল সঙ্গী হয়ে ব্যক্তির সময়ের সদ্ব্যবহারে এর জুড়ি মেলা ভার। পরচর্চা, পরনিন্দা বা অলস সময় না কাটিয়ে একখানা ভালো বই পড়ে অবসর সময়টুকু কাটালে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। সংসারের নানা ঝামেলায় মন যখন বিষণ্ন বিপর্যস্ত তখন বই আমাদেরকে আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে। বিষাদের মধ্যে বই হরষের ঝরনা এনে দেয়। দূরপাল্লার ভ্রমণে পথ যখন কিছুতেই কাটতে চায় না, তখন আমরা বইয়ের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার সঙ্গী হয়ে যাই। মনকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেতে পারি। আনন্দে সময় ক্ষেপণ করতে সহায়তা করে।

বর্ষণমুখর দিনে অবিরল ধারায় যখন বাইরে যাবার পথ রুদ্ধ তখন পুস্তকই মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে শান্ত করতে সহায়তা করে। প্রখর খরতাপে যখন মন কাজের অনুপযোগী তখনও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় গ্রন্থ পাঠে।

পুস্তক পাঠের উপযোগিতা লক্ষ করে বিভিন্ন মনীষী নানা মন্তব্য করেছেন। পুস্তক সম্পর্কে টলস্টয় বলেন– জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন বই, বই, বই। বুলওয়ার লিটন বলেন– আইনের মৃত্যু হয় কিন্তু বইয়ের মৃত্যু হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন– লাইব্রেরির দান অসীম ও অনন্ত।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস– বিচিত্র বিষয়ের এক বিপুল সমাহার পুস্তক। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের যে নানা বিষয় তা পুস্তকেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। শেক্সপিয়র, টলস্টয়, বায়রন– তারা ভিন্ন দেশীয় লেখক কবি হলেও তাদের দর্শন সব পুস্তকের মাধ্যমে জানা যায় এবং পৃথিবীর সাহিত্যপ্রেমী, বর্তমান প্রজন্মের আধুনিকেরাও সপ্তসিন্ধুকে অতিক্রম করে ঘরে বসেই স্বাদ নিচ্ছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যাদের অবদান অপরিসীম, নিত্য নতুন আবিষ্কারে আজকের পৃথিবীকে যারা সমৃদ্ধ করে গেছেন তাদের কথা পুস্তক-ই সাক্ষী দেয়।

বলা হয়ে থাকে সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ। তাই জাতির ঐশ্বর্যের সঙ্গে বইয়ের মাধ্যমে যেমন আমরা পরিচিত হতে পারি, তেমনি সেই সময়কার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ জানতে পারে।

এদেশের বর্তমান প্রজন্ম ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু এ সংক্রান্ত নানা পুস্তক পাঠ করেই তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। ভাষা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা বিদেশি গ্রন্থের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি ভাষার বই বাংলায় অনূদিত হওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যেটি দেশের জন্য আশাব্যঞ্জক। কেননা বিশ্বায়নের এই যুগে মানুষ বিভিন্ন দেশের জীবন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংগীত– এককথায় সার্বিক বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। মূল পুস্তক কিংবা অনূদিত পুস্তক পাঠ করে সে সব বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। এভাবেই বই নানাভাবে মানুষের জীবনের জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে একটি জাতিকে শিক্ষিত করে তোলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক প্রকার মানুষ পুস্তকের আনন্দের জগৎ থেকে এমনিতে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন ফেসবুক, ইউটিউব, মুভি, গেমস–এসবের মধ্যেই তাদের দিন কাটে। টেকনোলজির ব্যবহার আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। যান্ত্রিকতার যুগে আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। আজকাল অনলাইনের মাধ্যমেই বই পড়া হয়ে থাকে কিন্তু বই হাতে নিয়ে পড়ার যে আনন্দ তা ডিভাইসের মাধ্যমে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। এতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সম্প্রতি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দ্যু' প্রকাশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে লেখক পাঠক সম্মিলনী শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নানা গুণীজন বই সম্পর্কে নানান অভিমত প্রকাশ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির কথা বলে বইয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা হচ্ছে। হাতে বই রেখে পাঠ করে যে আমেজ বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব, ডিজিটাল স্ক্রিনে পাঠ করে তা সম্ভব নয়। এভাবে চললে ভবিষ্যতের প্রজন্ম সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। কারও কারও অভিমত, ছেলেমেয়েরা এখন বই পড়তে চায় না, তারা মোবাইল ফোন দেখে পড়ে। ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই তারা পড়ে।

সাম্প্রতিক সময়ের বিদগ্ধব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা প্রণিধানযোগ্য। এ অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার উপায় অবশ্যই খুঁজতে হবে। অবশ্য আমরা আশাবাদী, এদেশের আপামর জনসাধারণ বই পড়ায় মনোযোগী হবে। জাতি শিক্ষিত হয়ে দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োগ করবে। এজন্য ফেব্রুয়ারির বইমেলা ও বছরের বিভিন্ন সময়ে যে বইমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে, তা জাতিকে ক্রমাগত বই পড়ায় মনোযোগী করবে। বই পড়ায় এ যুগের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। লেখক সমাজের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে পথনির্দেশনা দিবেন। এতে অচিরেই দেশ থেকে নানান অনাচার-দুর্নীতিমুক্ত হয়ে সমাজ হবে নির্মল। গড়ে উঠুক গ্রন্থবান্ধব সমাজ। সকলের বই পড়ার অভ্যাস উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হোক।

শওকত জাহান: প্রাবন্ধিক ও প্রধান শিক্ষক, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল, রামপুরা, ঢাকা

একুশের জানা অজানা গান

মঈনুল হক চৌধুরী

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'–একুশের গানে গানে ভাষা বন্দনা আর শহিদদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার ছোঁয়ায় এগিয়ে চলেছে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ভাষা। কাল থেকে কালে উজ্জীবিত করে তোলে গোটা দেশ। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সীমানা পেরিয়ে এ ভাষা আজ পৌঁছে গেছে বিশ্ববাসীর মণি কোঠায়। গানের সুরে সুরে পৌঁছে গেছে ভাষাশহিদদের আত্মদানের অজানা ইতিহাস। তাইতো একুশের গান গেঁথে যায় সবার অন্তরে। যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয়ে ভাষা আন্দোলন আর একুশের চেতনাকে জাগ্রত করে রেখেছে একুশের গান। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা আর আলতাফ মাহমুদের সুর করা এ গানটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ভাইয়ের রক্তে রাঙা রাজপথ আর ছেলেহারা মায়ের অশ্রুভেজা চোখ। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বাহান্নতে ছাত্র-গণহত্যার প্রতিবাদে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সে বছর বিলি করে ছাত্র-জনতার মাঝে। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শহিদ দিবস পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সেখানে শহিদ দিবসের জন্য একটি গানের প্রয়োজন পড়ে। এই কবিতাটি তখন ছাত্রদের কাছে বেশ পরিচিতি পেয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনুরোধে এই কবিতাকে প্রথমে সুর দেন আবদুল লতিফ। পরে একই কথায় সুরারোপ করেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তাঁর তৈরি করা সুরেই গাওয়া হয় এখন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।' এই একটি গানই অমর করে রাখবে গীতিকার আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও সুরকার আলতাফ মাহমুদকে। অবশ্য ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম গান রচনা করেন ভাষা সৈনিক গাজীউল হক। প্রথমে অবশ্য কবিতা হিসেবেই তিনি লিখেন 'ভুলব না ভুলব না সেই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না।' পরে ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একটি জনপ্রিয় প্রচলিত সিনেমার গানের সুরের সঙ্গে কবিতার লাইন মিলিয়ে তৈরি করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান। ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত প্রথম গান নিয়ে অবশ্য খানিকটা বির্তকও আছে। কোনো কোনো গবেষকের মতে, ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান রচনা করেন মোশারফ উদ্দীন আহমেদ। ১৯৫২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তিনি লিখেন 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে/ আজিকে স্মরিও তারে' শীর্ষক একটি গান। গণসংগীত শিল্পী আব্দুল লতিফের কথা ও সুরে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটিও ভাষা দিবসের একটি উল্লেখযোগ্য গান। এই গানটি অবশ্য লেখা হয়েছিল বাহান্নর আগেই ১৯৫১ এর শেষ ভাগে। তবে গানটি সমাদৃত হয় বাহান্নর পরে। গানটির কয়েকটি লাইন পরবর্তীতে অবশ্য আব্দুল লতিফ পরিবর্তন করেছিলেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন মুকুল ফৌজের কর্মীদের নিয়ে প্রথম তিনি এই গানটি গান।

আব্দুল লতিফ এই গানটি ছাড়াও আরও একাধিক ভাষা আন্দোলনের সময়কার গান লিখেছিলেন, তার মধ্যে– 'আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলার' এখনও জনতার মুখে মুখে ফেরে। 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটি শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ একটি গান। ফজল-এ খোদার কথায় গানটি সুর করেন কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার। তিনি নিজেই প্রথম গানটিতে কণ্ঠ দেন। এই গানটি একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বাধিক পরিবেশিত একটি গান। মাতৃভাষা দিবস ছাড়াও এই গানটি স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে সর্বত্র পরিবেশন করা হয়। ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত আরেক কালজয়ী গান 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনও করিলিরে বাঙালি/ তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি'। শামসুদ্দীন আহমেদ রচিত গানটি সুর করেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। প্রথম কণ্ঠ দেন রথীন্দ্রনাথ রায়। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা নিয়ে লেখা হলেও এ গান ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রচয়িতার লেখা একুশের আরও কিছু গানের কথা উল্লেখ করা যায়– 'ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে ঘুমিয়ে গেল যারা' (বদরুল হাসান), 'শহিদি খুন ডাক দিয়েছে', 'রিক্ত শপথে আজিকে তোমারে স্মরণ করি' (তোফাজ্জল হোসেন), 'আমাদের চেতনার সৈকতে' (নাজিম মাহমুদ), 'মিলিত প্রাণের কলরবে' 'যৌবন ফুল ফোটে রক্তের অনুভবে' (হাসান হাফিজুর রহমান), 'সালাম সালাম হাজার সালাম' (ফজল-এ-খোদা), 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল), 'ফসলের মাঠে, মেঘনার তীরে' (শামসুর রাহমান), 'একঝাঁক পলাশের দুরন্ত রক্তে' (ইন্দু সাহা), 'বাংলা আমার মায়ের ভাষা এমন ভাষা আর যে নাই' (মোহাম্মদ মাতু মিয়া), 'সালাম আমার শহিদ স্মরণে' (শাহ আবদুল করিম), 'ভাষার জন্য জীবন হারালি', 'আমি বাংলা ভালোবাসি' (রমেশ শীল), 'বাংলাদেশের মানুষ, ফেব্রুয়ারি একুশে ভুলিতে পারবে না জীবনে' (বিজয় সরকার), 'শোন দেশের ভাই-ভগিনী', 'কাইন্দ না মা কাইন্দ না আর বঙ্গজননী' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস), 'বাঙালিদের বাংলা ভাষার রাখি ইজ্জত মান' (ফণী বড়ুয়া), 'এদিক-ওদিক বলতে আমার অনেক হবে দেরি' (আবদুল হালিম বয়াতি)। একুশের গানের সুরকারদের মধ্যে রয়েছেন– আলতাফ মাহমুদ, আব্দুল লতিফ, মোমিনুল হক, নিজাম উল হক, সমর দাস, সত্য সাহা, সাধন সরকার, আজাদ রহমান, আবদুল আহাদ, শেখ লুৎফর রহমান, খোন্দকার নূরুল আলম, অজিত রায়, লোকমান হোসেন ফকির, আবদুল জব্বার, খান আতাউর রহমান, রমেশ শীল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, আবেদ হোসেন খান, দেবু ভট্টাচার্য, বশির আহমেদ, রাম গোপাল মোহান্ত, সুখেন্দু চক্রবর্তী, হরলাল রায়'সহ আরও অনেকে।

১৯৫২ সালের অমর একুশের ৭১ বছর পূর্ণ হলো। এ কথা এখন দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে এ ভূখণ্ডের বাঙালির যা কিছু অর্জন তার পুরোটারই নেপথ্যে রয়েছে অমর একুশের অনন্য ভূমিকা। বাহান্নর একুশে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে– তাদের ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করেছে। যার ফলে একাত্তরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। মহান ভাষা আন্দোলন কেন্দ্র করে রচিত এসব গান আমাদের জাতিসত্তার জাগরণে প্রেরণা জুগিয়েছে। উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে সংগ্রাম, শপথ ও দেশপ্রেমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। উল্লেখ্য, অমর একুশের সাত দশকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও আজ অবধি একুশের গানের উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি। যার ফলে একুশের গানের অধিকাংশই রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে-পত্রপত্রিকা ও সংকলনের পাতায়। তাই বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির চিরকালীন সম্পদ হিসেবে এসব গানের সংরক্ষণ এবং প্রচার খুবই জরুরি।

মঈনুল হক চৌধুরী: লেখক ও সাংবাদিক

কথাসাহিত্যে সুন্দরবন

গাজী আজিজুর রহমান

সাহিত্যের আধার কী হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। সাহিত্যের আধার বিপুল ও বৈচিত্র্যময়। এখানে এক বহু হয়, বহু হয় এক। এটা নির্ভর করে একজন লেখকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মানবদর্শন, জীবনদর্শন, বাস্তবতা ও ইতিহাস চেতনা কত গভীর ও চিন্তাঋদ্ধ তার ওপর। অতঃপর ভাষা নৈপুণ্য ও শিল্পচেতনা তার ওপর প্রক্ষেপ করে হীরের দ্যুতি। আর লেখায় এসবের ব্যত্যয় ঘটলে তা হয়ে ওঠে নিষ্প্রভ, সস্তা, দায়িত্বহীনতার নামান্তর।

বাংলা কথাসাহিত্যের একশো বছরের যে অর্জন, সমৃদ্ধি ও পদ্মা-প্রবাহ তা দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ, সাতচল্লিশের দেশভাগ, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, আধুনিকতার উন্মেষ এবং পাশ্চাত্যায়নের ফসল। এরমধ্যে শিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্তের উত্থান, রাজনীতি সচেতনতা, জীবনবোধের ব্যাপ্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির নব বিন্যাস, ঘন ঘন সংকট, যুদ্ধ যুদ্ধ উত্তেজনা, সুখ-স্বস্তির নির্বাণ আমাদের কথাসাহিত্যকে অ্যান্টি রোমান্টিক ও অ্যান্টি রোমাঞ্চ করে তোলে। কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশ বিভাগের দুর্দৈব, মধ্যবিত্তের হতাশা-হাহাকার, ব্যক্তির আত্মপরায়ণতা ও বঞ্চনা, শহুরে সভ্যতার গ্লানি, নিম্নবর্গীয় মানুষের মানবেতর জীবন, গ্রামের ভিটেমাটির লড়াই, আঞ্চলিকতা, শিকড় সন্ধানসহ স্বাধীনতার যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মানবিক বিপর্যয় ধারণ করে প্রসারিত হয়েছে আমাদের কথাসাহিত্য। কিন্তু এসব নিয়ে গত একশো বছরে *গোরা*, *গৃহদাহ*, *পথের পাঁচালী*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *গঙ্গা*, *গড়শ্রীখণ্ড*, *All quiet on the wester Front*, *উপনিবেশ* বা *Old Man And The Sea*-এর মতো একটিও উপন্যাস লেখা হয়নি এদেশে। *লালসালু*, *সূর্য দীঘল বাড়ি*, *জননী* বা *খোয়াবনামা*'র মতো দু'চারটি লেখা বাদ দিলে উল্লেখ্য কোনো কথাসাহিত্য পাওয়া দুষ্কর।

আমাদের কথাসাহিত্য যেটুকু সিদ্ধি লাভ করেছে সে ঐ গ্রাম জীবননির্ভর আঞ্চলিক লেখাগুলো। *লালসালু* থেকে *কাশবনের কন্যা*, *পথ জানা নাই*, *কাঞ্চন গ্রাম*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি*, *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*, *জননী*, *সংশপ্তক*, *নূরজাহান*, *কর্ণফুলী*, *জলরাক্ষস*, *জলপুত্র* ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

লেখক মাত্রেই থাকে বিচিত্র অভিলাষ। সে তার লেখায় পারলে সমস্ত পৃথিবীকে বানাতে চায় তার লেখার চরিত্র। সমস্ত মানুষকে করতে চায় তার লেখার উপজীব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দের লেখায় তার পরিচয় মেলে। আবার সেই লেখকই লেখার আশ্রয়স্থল করে কোনো গ্রাম, কোনো শহর, কোনো এলাকা বা অঞ্চল। সে চিত্র তার কালের হোক আর না হোক, চেনা-শোনা-জানা হোক বা না হোক, দেখা বা অদেখা– সে লিখতে চায় সে কথা, আঁকতে চায় সে ছবি। শুধু চাক্ষুস দেখাটাই সাহিত্য নয়, মানস চক্ষে দেখাটাও সাহিত্য। লেখকরা মানস ভ্রমণ, স্বপ্ন ভ্রমণেও পটু হয়। তা থেকেই তো বিভূতিভূষণ লেখেন *চাঁদের পাহাড়*, জীবনানন্দের *বনলতা সেন* বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের *সত্যাসত্য*, (১৯৩২-১৯৪২)-তে তো সমগ্র ইউরোপই উদ্‌ঘাটিত। সুতরাং ইউরোপে বসে ওয়ালীউল্লাহ *লালসালু* লিখবেন এ আর বিচিত্র কী! মূল কথা হচ্ছে, যাই লিখুক দেখে বা না দেখে তা যদি সত্যি হয়ে ওঠে, যথাযথ হয় ভাষা ব্যবহারে, প্রকৃতি বর্ণনায়, জীবনযাপনে, ধর্মাধর্মে, স্বভাব-চরিত্রে, লোকসংস্কারে, বাঁচার সংগ্রামে তাহলে কি-ই-বা এসে যায় মক্কা-মদিনায়।

আঞ্চলিক সাহিত্যের এক উর্বর ভূমি সুন্দরবন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে এর অবস্থান। একটি জেলার সমান প্রায় এর আয়তন। নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এর আকার-আয়তন পরিবর্তন হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করলেও এর ইতিহাস হাজার বছরের। খুব প্রাচীন এই ঐতিহ্যটি আজও পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ অঞ্চল। গভীর নির্জন জল-জঙ্গলে পরিপূর্ণ, শ্বাপদসংকুল এই ভয়াল অরণ্য যেন এক সবুজ সমতল। কত যে রহস্য, কত যে এর কাহিনি-কিংবদন্তি, কত যে এর সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি তার আদি-অন্ত নেই।

এই বনে বাস করে শ্বাপদেরা আর অসংখ্য পাখপাখালি ও কীটপতঙ্গরা। এটা কোনো মনুষ্য বসতি স্থল নয়, সরকারি কর্মচারী ও প্রহরীরা ছাড়া, এখানে আগত সব মানুষজনই অস্থায়ী– সে জেলে, মাঝি, মৌয়াল, বাওয়াল, শিকারি, পর্যটক যেই হোক না কেন। এর আশপাশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যে মুণ্ডারা বাস করে তাদেরও এই অরণ্যে অধিকার নেই। এছাড়া আশপাশের মানুষ যারা মূলত গরিব, চাষি, জেলে, মজুর অরণ্যনির্ভর জীবনযাত্রা করে তারাও অরণ্যে অনাহত। শুধু জীবিকানির্বাহের জন্য অরণ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক– যে সম্পর্ক ভয়ের বৈরিতার, দুশ্চিন্তার, মৃত্যুর পরোয়ানায় লিখিত।

সুন্দরবনের একচ্ছত্র অধিপতি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তারপর কুমির, কামট, সাপ, শূকর, বানর, হরিণ, গুইসাপ, ভোদড়, বয়ার, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি। আর পাখি, সাপ, মাছের তো প্রকারের কোনো শেষ নেই। সুন্দরবন কাঠসহ সম্পদের আধার।

এর ইতিহাস যেমন প্রাচীন তেমন বিচিত্র। ভয়াল রূপের সাথে অনিন্দ্যসুন্দর এর সৌন্দর্য। পৃথিবীর অদ্বিতীয় তৃণভূমির নাম সুন্দরবন। ব্যঘ্রতট নামেও বিখ্যাত। কুমিরতটও। তবু মানুষ এখানে আসে জীবনটা হাতে করে জীবিকার সন্ধানে।

সুন্দরবনকে নিয়ে যত না সাহিত্য রচিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি লিখিত হয়েছে এর ইতিহাস। সতীশচন্দ্র মিত্র, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, রাধা গোবিন্দ বসাক, সুরেন্দ্রনাম মজুমদার, নীহার রঞ্জন রায় থেকে কমল চৌধুরী সুকুমার সিং, মোহাম্মদ তোহা খান, নিখিল নাথ রায়, জেমস ওয়েস্টল্যান্ড ইত্যাদি। আর সাহিত্যে সুন্দরবনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বিপ্রদাসের *মনসামঙ্গল*-এ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*-এ, কৃষ্ণরামের *রায়মঙ্গল*-এ, বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা*'য়, রবীন্দ্রনাথের *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট* ইত্যাদি কাব্য ও কথাসাহিত্যে।

সুন্দরবন তার সবুজ শক্ত বেষ্টনী দিয়ে আগলে রেখেছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ও এ অঞ্চলের মানুষকে। তবু নিত্য ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত এখানকার মানুষ। নিত্য ভাঙা-গড়ার সংগ্রামে নিরত থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বেঁচে আছে সব হারানোর আতঙ্ক নিয়ে। বাঘ, কুমির, সাপ ছাড়া বনদস্যুদের আক্রমণ, এলাকার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের দমন-পীড়ন, বনরক্ষকদের শোষণ-শাসন-নির্যাতনকে ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়ে এরা যাপন করে মানবেতর জীবন। এদের একমাত্র ভরসা লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, শা-জলঙ্গী, গাজী কালু খাঁ আর মনসাদেবী, ওলা বিবি, শীতলাদেবীরা। তাইতো বনজীবীরা বনে প্রবেশের মুখে প্রার্থনা করে–

> মা বনবিবি, তোমার বাল্লক এলো বনে, থাকে যেন মনে
> শত্রু দুষমণ চাপা দিয়ে রাখ গোড়ের কোণে।

অথবা–

> ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে/দক্ষিণ রায় নমোস্তুতে।

সুন্দরবন দুর্গম। সুন্দরবন ভয়ংকর। সুন্দরবন মৃত্যুফাঁদ। সুন্দরবন অশরণ। তবু সুন্দরবন মানুষের আকর্ষন, মানুষকে টানে, সম্মোহিত করে। জীবিকার টানে মানুষ এখানে আসে সব ভয়ভীতি উপেক্ষা করে, মৃত্যুকে ভৃত্য করে, নিরুপায় হয়ে। প্রতিকূলতা, বৈরিতা, শত্রুতাকে পায়ে দলে এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষ বনে আসে আহার্য সংগ্রহে। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এদের পূর্বাপর ভাবার সুযোগ দেয় না। কিন্তু দিনবদলের কোনো আশা নেই জেনেও সুন্দরবনই তাদের শেষ সম্বল মেনে নিয়ে চলে জীবনধারণের তপস্যা। সুন্দরবনও সেই জীবন নিয়ে আমাদের কথাসাহিত্য কতদূর অগ্রসর হলো সেটাই আমাদের আলোচ্য।

দুই

সুন্দরবন নিয়ে কিছু লিখতে গেলে সেটা আঞ্চলিক হয়ে যাবে এমনটা ভাবা দুর্বলতা। সব আঞ্চলিকতা নিয়েই দেশের মুখ ও মুখশ্রী। খণ্ডিতকে অখণ্ড, অংশকে পূর্ণতা দান করা সাহিত্যিকের কাজ। সব লেখাইতো আঞ্চলিক। ঢাকাতো সমগ্র দেশ না। বাংলাদেশ তো এশিয়ার একটা অঞ্চল। এক অঞ্চলের সাহিত্য অপর অঞ্চলে কিছুটা অপরিচিত, ভাষাও দুর্বোধ্য। তবু রচনাগুণে *পদ্মা নদীর মাঝি*, *তিতাস একটি নদীর নাম*, *অরণ্যের অধিকার*, *গঙ্গা*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* বা *সারেং বৌ* যেন সব অঞ্চলের কাহিনি, সব মানুষের কাহিনি। সে হিসেবে *জলপুত্র*-এর পতেঙ্গার সমুদ্রগামী জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ও সুন্দরবনের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের পটভূমিতো প্রায় অভিন্ন। সুতরাং আঞ্চলিকতা সাহিত্যের কোনো সীমানা নয়, দূর হয়েও দূরত্ব নয়। আমরা যদি মনোজ বসুর *জল জঙ্গল*-এর 'বনবিবি' ও 'সত্যপীরের' উপাসক চাষি-মজুরের সাথে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*'র 'বাবা কালারুদ্দুর'-র উপাসক চাষি-মজুরের মানসিকতা পর্যালোচনা করি, দেখব তাদের মানসিকতা কিছুটা তফাৎ হলেও খুব দূরাদূর নয়। কেবল স্থানিক রংটা একটু আলাদা হয়, আহার-বিহার কিছুটা ভিন্ন হয়, কিন্তু ক্ষুধা, লৌকিক-পারলৌকিক বিশ্বাস, যৌনাচার বা স্বপ্নের বিশেষ হেরফের হয় না। সেটাই আঞ্চলিক সাহিত্য যে লেখা দুর্বল, যে লেখায় কারুকুশলতা নেই, সে লেখা বাস্তব অপেক্ষা লেখকের জীবনবোধ, ধ্যান-ধারণা, রাজনীতি, বিশ্বাস বড়ো হয়ে ওঠে– সে লেখা আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট হতে পারে।

মিখাইল সলোকভের *ধীরে বহে ডন*– ডন নদীর দুপারের মানুষের জীবন ও সংগ্রাম, চিত্র ও চরিত্র সেতো সমগ্র রাশিয়াকেই রিপ্রেজেন্ট করে। কিম্বা পাভেল বাকোভের *মালাকাইটের ঝাঁপি*'র কাহিনিতে উঠে এসেছে যে উড়াল অঞ্চলের জনজীবনের কাহিনি, ভাষা ও লোকগাথা– তা তো সমগ্র রুশদেরই ঐতিহ্য। টমাস মানের বুডেনব্রুকস পরিবারের যে কাহিনি তা কি বিশ্ব শতকের জার্মানদের প্রতিটি ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের চিত্র নয়? সুতরাং সাহিত্যগুণ সম্পন্ন কোনো সাহিত্য আঞ্চলিক সাহিত্য নয়। যে লেখায় আবহমানতা আছে, যে লেখায় জীবনবোধ গভীর ও ব্যাপক, যে লেখা চির নতুন, হার্দিক ও হিরন্ময় সে লেখা ঘরে বসেও সমুদ্রের স্বাদ মেটায়, বনের পিপাসাকে তৃপ্ত করে, পাহাড়ের মহত্বকে অনির্বাণ করে রাখে।

এত ঐতিহ্য, এত অনিন্দ্যতা, এত আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যে সুন্দরবন খুব প্রাধান্য লাভ করেনি। সেই কবে রবীন্দ্রনাথ *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩) লিখেছিলেন সুন্দরবনকেন্দ্রিক রাজা প্রতাপাদিত্য, বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, সুরমা বা বিভাকে নিয়ে। তারও একটু আগে বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরবনের পটভূমিকায় লিখেছিলেন, *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাস। সেখানে সুন্দরবনের মানুষের জীবন-জীবিকা ছিল উপেক্ষিত। তাই এ দুটো লেখা ঠিক সুন্দরবনি লেখা নয়। সুন্দরবনি লেখা প্রথম লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বল্প পরিচিত কিশোর উপন্যাস *সুন্দরবনে সাত বৎসর* (১৯৫২) নামক গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটির মেজাজ, ভাষা, বর্ণনা, চরিত্র সবই সুন্দরবনকেন্দ্রিক। দুবলারচর থেকে সমগ্র সুন্দরবন, নদী, সমুদ্র, মন্দির, বনবিবি মাহাত্ম্য, ডাকাত মগ সন্তান মনু, অপহৃত কিশোর নীলু, মাঝি বদরুদ্দীন, বুড়ো তাদের দুর্বিষহ বনজীবন, অনিশ্চয়তা, তবু বনের অধিকার ছেড়ে তারা যেতে চায় না, কারণ এ এক অদ্ভুত বনসম্মোহন, এর স্বাদ বাঘের মানুষ খাওয়া স্বাদের মতো। কিন্তু এরা কেউ মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার-এর বীরসার মতো বীর নয়, অসাধারণ নয়, অনুকরণীয় চরিত্র নয়। এরা সুন্দরবনের সহজসরল মানুষ। বেঁচে থাকাই তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। ন্যায়-অন্যায় বাঁচার কাছে তুচ্ছ।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৯৭৮ সালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম *জায়জঙ্গল* নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন সুন্দরবনের পটভূমিতে। এটি লেখকের কোনো বিখ্যাত লেখা নয়। তিনি পরিচিত *কাশবনের কন্যা* ও *কাঞ্চনগ্রাম*-এর জন্য। এখানে বাহির থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী শেখ জয়নাল ও তার পরিবার সুন্দরবন সংলগ্ন বেড়িবাঁধের নীচে উঁচু মাচা করে বাস করে বাঘ-শূকরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। এরা জলে-স্থলে সংগ্রাম করে বননির্ভর জীবননির্বাহ করে। তার চেয়ে তাদের জীবনে নিত্য আতঙ্ক এখানে বসবাসকারী সামন্ত প্রভুরা। সব বাধা অতিক্রম করে এরা বেঁচে থাকার সংগ্রামে সব বিপদ-আপদ মেনে এই অনিরাপদ বসতিকে জীবনের উপায় করে নিয়েছে অনন্যোপায় উপায় হয়ে। এখানে শেখ জয়নালের বননির্ভর জীবন সংগ্রামের চিত্র নেই। এ জীবন তাই খণ্ডিত সত্য। এখানে বনের বাঘ-বাঘ নয়, বাঘ হচ্ছে মহাজন জলিল মিঞারা। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ মানুষের যে শ্রেণি সংগ্রাম তাই এখানে হয়ে উঠেছে মুখ্য।

স্বামীকে বাঘে খাওয়ার মৃত্যুর অপবাদ বহন করতে হয় স্ত্রী শরবানুকে। সুন্দরবন অঞ্চলে আধুনিক সমাজের কোনো ছোঁয়া যে লাগেনি শরবানুর জীবন তার উদাহরণ। এখানে চলে যাবতীয় কুসংস্কার, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা। সেলিনা হোসেনের *দিনকালের কাঠখড়* উপন্যাসে উঠে এসেছে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সেই প্রসঙ্গ, যা অত্যন্ত অমানবিক ও নিষ্ঠুর। এও সুন্দরবনের খণ্ডিত এক সত্য।

হুমায়ূন রহমানের *বাওয়ালী* উপাখ্যান (১৯৯৭) বা খসরু চৌধুরীর *নতুন বাওয়ালী* (২০১৭), *সুন্দরবনের বাওয়ালী*, যারা অবশ্যই নিম্নবর্গীয় মানুষ যাদের পেশা বন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করে জীবিকানির্বাহ করা, শুধু এই একটি পেশাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। কাহিনিতে কোনো নতুনত্ব নেই। সেই বিত্তশালী মহাজন, জোতদারদের প্রতাপে অসহায় এই দরিদ্র শ্রেণিটি কীভাবে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার তার একটি নির্মম কাহিনি লেখকদ্বয় তুলে ধরেছেন এই দুই উপাখ্যানে।

বরং স্বকৃত নোমানের *কালকেউটের সুখ* (২০১৫) উপন্যাসে ও *চাণক্য বাড়ৈর জলমানুষ* (২০২০) উপন্যাসের কাহিনি একটু আলাদা কিন্তু অপরিপক্ব ও বৈচিত্র্যহীন। সেই পুরোনো চিন্তা ক্ষমতাসীনদের দাপটে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষরা কীভাবে নির্যাতিত এবং প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করে চলে যায় অন্য দেশে অথবা অপহৃত হয়, মৃত্যুবরণ করে এই বনজীবীদের কাহিনি এখানে ব্যাপৃত। মানুষের লোভ-লালসা, হীনতা, হিংস্রতা, চাতুর্য যে সর্বত্র বিরাজমান সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের এই অনৈতিকতা চিরকাল ছিল, আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে তা যেন আছে আরও একটু বেশি, কারণ এখানে এসব ঘটানো ও পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ বেশি, দুর্গমতা ও সভ্যতাহীতার কারণে। তাইতো এখানে এত নির্মমতার কাহিনি, নির্দয়তার কাহিনি। কিন্তু সুন্দরবনের যে রহস্য ও সৌন্দর্য, সুন্দরবনের যে অরণ্যে আসক্তি অজানা জীবন ও নিসর্গের নিঃসীমতা তার অভাব পরিলক্ষিত হয় সব লেখায়। একমাত্র ব্যতিক্রম বিভূতিভূষণের লেখাটি। প্রকৃত সুন্দরবনের জীবন ও জগৎ যেন তাঁরই কলমে বাঙ্ময়।

এই ধারায় সতীশচন্দ্র মিত্র ও শিবশঙ্কর মিত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন *সুন্দরবন সমগ্র* (১৯৮৮) নামে। গ্রন্থটি ঠিক কথাসাহিত্যের পর্যায়ে না পড়লেও এখানে বনবিবি থেকে বেদে বাউলে, আর্জান সরদার বা বিশ্বের যে কাহিনি ও কিংবদন্তিগুলো লিখেছেন সেখানে প্রকৃতই খুঁজে পাওয়া যায় সুন্দরবনি জীবনকে ও জীবন সংগ্রামকে। এর ভাষাও যথাযথ। জঙ্গলা ভাষা নামে পরিচিতি যার তিনি তা প্রয়োগ করে সার্থকতা দেখিয়েছেন। এটাকে বাদার ভাষাও বলা হয়। কিন্তু আমাদের লেখকরা সেই ভাষা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। শামসুদ্দীনের 'পড়ছে', 'খাউক', 'দেওলের', 'হইয়া', 'চাণক্য বাড়ৈয়ের', 'খাইল', 'খাইছে', 'আইল' অথবা হুমায়ূন রহমানের 'আইয়া', 'ধইর‍্যা', 'থাহে', 'টাহা', 'আওনের' ইত্যাদি ভাষা কি সুন্দরবনের ভাষা? সুন্দরবনের ভাষা হচ্ছে– 'আফালি' (আস্ফালন), 'কালাবন' (নিঠড়ে বন), 'কোলা' (খালের কূলে প্রশস্ত স্থান), 'গোন' (নদীর অনুকূলে স্রোত), 'ঘোঘা' (ভেড়ীতে ছিদ্র), 'জো' (জোয়ার), 'নেমক' (লবণ), 'বাদা' (জঙ্গল), 'ভোঁতড়' (বাঘ), 'সড়া' (ছোটো খাল), 'না' (নৌকা) ইত্যাদি।

১৯৯৮ সালে *কিশোর তারকালোক*-এ প্রকাশিত হয়েছিল গাজী আজিজুর রহমানের কিশোর উপন্যাস *মামার সাথে মামা দেখা*। এটা সুন্দরবনে শিকারে যেয়ে মামা-ভাগ্নের বাঘ দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতা বিষয়ক একটি লোমহর্ষক উপন্যাস। এতে সুন্দরবনের স্বাদ আছে, বাস্তবতা আছে, ভাষাও যথাযথ। সব মিলে লেখাটি সুন্দরবনকে রিপ্রেজেন্ট করে।

তিন

প্রতিভা বসু তার জীবনের জলছবি গ্রন্থে লিখেছিলেন– 'পাহাড় দেখতে কি পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়? সমুদ্র দেখতে কি সমুদ্রের জলে নামতে হয়?' সত্য-মিথ্যা জানি না তবে সুন্দরবন দেখতে সুন্দরবনে নামতে হয়। না হলে সুন্দরবন অনাস্বাদিত থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা– 'নদী চলিছে ডাইনে বামে/ কভু কোথাও সে নাহি থামে/ হে যায় গহন গভীর বন/ তীরে নাহি লোক নাহি জন/ শুধু কুমীর নদীর ধারে/ সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে/ বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝোপে/ ঘাড়ে পড়ি আসে এক লাফে।' এই বর্ণনা মানে কি সুন্দরবন? সুন্দরবন আরও অনেক কিছু। পল্লিকবি বলেন, 'সুন্দরবন মাগো আমার আশা ভালোবাসার/ জল-জঙ্গল বাঘ নিয়ে রই জীবনের বাসায়/ বন কেটে মা বসত গড়ি তোমার বুকের মাঝে/ মোম-মধু আর মাছ মেরে যে জীবন কাটে কাজে/ জল-বন্যায় ঘর ভাসে মা জমি খরায় পোড়ে/ স্বজনহারা শিশু কাঁদে একটু ভাতের তরে/ জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ/ লড়ছি বাঁচা মরায়/ জীবন-মরণ ঘিরে আছে বনবিবির মায়ায়।'– এই হলো সুন্দরবন। এ হচ্ছে দেখা সুন্দরবন, অভিজ্ঞতার সুন্দরবন। সেই বনের চিত্র-চরিত্র নিয়ে কি আমাদের লেখকরা লিখেছেন গল্প-উপন্যাস?

মোহাম্মদ মুন্সী রচিত *বনবিবি জহুরানামা* (১৩০৫), একই নামে লেখা মোহাম্মাদ খাতেরু গ্রন্থ (১২৮৭) কিম্বা কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল কাব্য*-তে সুন্দরবনের সে স্বাদ, সৌন্দর্য ও কাহিনি-কিংবদন্তি পাওয়া যায়, তার স্বাদ কি মেলে শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সেলিনা হোসেন, খসরু চৌধুরী বা চাণক্য বাড়ৈর গ্রন্থে?

সুবোধ ঘোষের *টোরি জঙ্গলের ভক্তবাঘ* (১৯৭৯) যারা পড়েছেন তারা হাজারিবাগের সিংভূম মান-ভূমের বনের এক অপূর্ব স্বাদ পাবেন এই উপন্যাসে। এখানে একটা ম্যান ইটার বাঘের দুর্দশা দেখে আপনি হাসবেন না কাঁদবেন ধাঁধায় পড়ে যাবেন। কী রংচঙে সে লেখা, কী উত্তেজনা ও বিক্রমী সে লেখা, ভাষার প্রসাদগুণে উজ্জ্বল। অথচ আমরা সুন্দরবন নিয়ে তেমন বাস্তববাদী, রোমান্টিক, বর্ণাঢ্য, রঙিন, চড়া স্তরের কাহিনি পাই না– যা হতে পারত বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় *অরণ্যের অধিকার* বা *সুন্দরবনের সাত বৎসর* জাতীয় একটা এপিক গ্রন্থ।

সুন্দরবনের মানুষতো সুন্দরবনের মূল চরিত্র নয়– মূল চরিত্র হচ্ছে সুন্দরবন, তার নিসর্গ সৌন্দর্য ও শ্বাপদ-বিপদ। আর বনবিবি, দক্ষিণ রায় কিংবদন্তিসমূহ তো এই বাংলার মৌলিক সংস্কৃতি। সেই প্রেক্ষাপটেই লেখা হোক আগামী দিনে অসংখ্য নদী, সমুদ্র, বনবাদাড় পরিবেষ্টিত অবহেলিত উপেক্ষিত কিছু বন সংলগ্ন আদিম পেশার মানুষের গল্প। যে মানুষেরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে আমাদের আত্মীয়। জ্বলে উঠুক তিমির বনে নতুন সূর্যোদয় কারও কুশলী হাতে।

গাজী আজিজুর রহমান: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

`yb©Z‡K bv ejyb

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

ফাগুনের রঙে রঙে ভালোবাসা

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

রং লাগালে বনে বনে
ঢেউ জাগালে সমীরণে
...
উঠল সুর উচ্ছ্বাসি ফাগুন-বাতাসে।

নতুন রঙে সেজেছে বসন্তের প্রকৃতি। অজস্র পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম আভায় রঞ্জিত প্রকৃতি। প্রকৃতির সেই রূপের সঙ্গে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে নানান আয়োজনে পালিত হয় বসন্তবরণ। পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস একই দিনে হওয়ায় আনন্দ নিয়েছে ভিন্নতর রূপ। তরুণ-তরুণীরা সাজগোজ করে হলুদ ও বাসন্তী রঙের শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে বসন্তকে বরণ করতে ভালোবাসাময় দিনে ঘুরে বেরিয়েছেন। নারীদের কেউ কেউ মাথায় পরেছিলেন বিভিন্ন রঙের ফুল। বাদ যায়নি শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধরা। তারাও বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে বরণ করে বসন্তকে। গানে-গল্পে-আবৃত্তিতে ও আড্ডায় মেতে উঠেছিলেন সবাই। এ যেন ফাগুনের রং মেখে ভালোবাসায় বসন্তবরণ।

পহেলা ফাল্গুন। ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে বসন্তকাল। ফাল্গুন মাস ফাগুন নামেও অভিহিত। বসন্তের আগমনে আনন্দের রং লেগেছে বাঙালির মনে, দখিনা হাওয়ায় প্রাণবন্ত প্রকৃতি। গাছের ডগায় শোভা পাচ্ছে নতুন পাতা। বাগানে ফুটেছে বাহারি রঙিন ফুল। সবমিলিয়ে প্রকৃতির সর্বত্র উৎসবের আমেজ। মানবমনেও লেগেছে দোলা। ভাষা, সুর, ছন্দ বলে 'বসন্ত এসে গেছে'। একইসঙ্গে এদিনে ভালোবাসা দিবসও। ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দুটি উৎসব একইদিনে হওয়ায় আনন্দ-উদ্‌যাপনও যেন দ্বিগুণ হয়েছে। রাজধানীবাসীসহ সবাই মেতেছে বসন্ত-ভালোবাসার উদ্দীপনায়। এদিন কেউ বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে, কেউবা প্রিয় মানুষটির সঙ্গে, কেউবা পরিবারের সঙ্গে উৎসবে মেতে উঠেছেন। সবাই একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করেন বসন্তের ও ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। সেইসঙ্গে সেলফি তো আছেই। সব মিলিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ।

ভালোবাসার বিশেষ এই দিনে নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় পহেলা ফাল্গুন বা বসন্তবরণ। বসন্তের এই প্রথম দিনটিকে বরণ করে নিতে ঢাকায় সবচেয়ে বড়ো আয়োজন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায়। জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের এ আয়োজনে নানা সাজে অংশ নেয় সব বয়সের মানুষ। এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি স্থপতি সফিউদ্দিন আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন। উৎসবে আবৃত্তিশিল্পী আহসান উল্লাহ তমাল ও নুসরাত ইয়াসমিন রুম্পার সঞ্চালনায় একক আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নায়লা তারাননুম চৌধুরী।

সকাল থেকে শুরু হয় বসন্তবরণ অনুষ্ঠান। সারেঙ্গি বাদন ও শাস্ত্রীয় সংগীতে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। রাগ-সুর, গান, আবৃত্তি আর নৃত্যের তালে তালে বসন্তকে অভিবাদন জানায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। হলুদ শাড়ি, রঙিন পাঞ্জাবি আর ফুলের মালা পরে ফাগুনের প্রথম দিনকে স্বাগত জানান তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সি মানুষ। বকুলতলা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চষে বেরিয়েছেন তারা। টিএসসি, হাকিম চত্বর, লাইব্রেরি, অপরাজেয় বাংলা, বিজনেস ফ্যাকাল্টি, কার্জন হল, অ্যানেক্স ভবন, শহিদমিনার, অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণসহ পুরো এলাকায় বাসন্তী সাজে দেখা গেছে অধিকাংশকে। ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর, বেইলি রোড, হাতিরঝিলসহ রাজধানীর সব বিনোদন কেন্দ্র উৎসবমুখর।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে বসন্তের পোশাক প্রদর্শনী ও কোরিওগ্রাফির নান্দনিক আয়োজন। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় মনোমুগ্ধকর অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, সংগীত পরিবেশন করেন মন্টি দাস, সালমাসহ একাডেমির গুণী শিল্পীরা। এছাড়াও পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন মঞ্চসারথি আতাউর রহমান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এই বর্ণিল উৎসবে বিশেষ আয়োজনে ১০ জন দর্শককে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমির নন্দনমঞ্চে ছিল বসন্তবরণের নানা আয়োজন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন জেলা শাখার উদ্যোগেও বসন্তবরণ পালিত হয়।

একক ও দলীয় মণিপুরি নৃত্য, ভরতনাট্যম, ওড়িশি ও কত্থক নৃত্যের মধ্য দিয়ে বসন্তবরণ করে ছায়ানট। দুদিনের এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন মিলনায়তনে।

বসন্ত সাজে নরনারী মেতেছে আনন্দে। রাজধানীসহ সারা বাংলাদেশের উদ্যানে উদ্যানে ফুল আর ভালোবাসার রং। সারা দেশের নানান সংগঠন, সাংস্কৃতিক পরিষদ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়োজনে নরনারী মেতে উঠেছে এ উৎসবে। রাজধানী ঢাকাসহ জেলা, উপজেলা শহরগুলোতেও জমেছে এ উৎসব। কোথাও কোথাও এর সঙ্গে বইমেলা যোগ করেছে নতুন মাত্রা। কোনো কোনো জেলায় এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পিঠা উৎসব। যেমন– বসন্তবরণ ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে অংকুর নাট্য একাডেমির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বসন্তবরণ, পিঠাপুলি, সাংস্কৃতিক ও নাট্য উৎসব সম্পন্ন হয়। শীতকে বিদায় জানিয়ে নাচে, গানে ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে নেয় বাঙালি। এর সঙ্গে বর্ণিল শোভাযাত্রা।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বয়ে চলে দক্ষিণা হাওয়ার মাতাল সমীরণ, বাতাসে পাতা ঝরার শব্দ, সেইসঙ্গে গাছে গাছে নতুন পাতা আর ফুলের সমারোহ। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোকিলের কুহুতান আবেগী মনকে করে তোলে উদাস। বসন্ত প্রভাবিত করেছে কবি মনকেও। 'বাতাসে বহিছে প্রেম নয়নে লাগিল নেশা/ কারা যে ডাকিল পিছু বসন্ত এসে গেছে/ মধুর অমৃত গানে জানা গেল সহজে/ মরমে এসেছে বাণী বসন্ত এসে গেছে...!'

কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত– 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে/ ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে/ আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে'।

বসন্ত ফুলের ঋতু। বসন্ত মানেই চোখধাঁধানো ফুলের সমাহার। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঁঠালচাঁপা, কাঠগোলাপ, নাগেশ্বর, রুদ্রপলাশ, মহুয়া, রক্তকাঞ্চন, দেবদারু, স্বর্ণশিমুল প্রভৃতি ফুল। এ বসন্তে থোকায় থোকায় ফোটে দোলনচাঁপা। ফোটে অশোক, পলাশ, শিমুল। শহরে পহেলা ফাগুনে ফুলের দোকানে দোকানে ভিড়। তাই তো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

বসন্ত বাতাসে সই গো
বসন্ত বাতাসে,
বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ,
আমার বাড়ি আসে।
সই গো বসন্ত বাতাসে!

বাঁধনহারা মন এ সময় গেয়ে ওঠে– 'মধুর বসন্ত এসেছে, মধুর মিলন ঘটাতে'।

বসন্ত উৎসবে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রিত হয়েছে। বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবস পালনে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চিত্রই ফুটে উঠেছে। বসন্ত মন উদাস করে, হাসতে শেখায়, গাইতে শেখায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। ভালোবাসা দিবস আর প্রকৃতির পালাবদলের বসন্তবরণ একইসঙ্গে দোলা দেয় আমাদের জীবনযাপনে। ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় ভালোবাসার রঙে রঙিন হয় হৃদয়। শুধু তরুণ-তরুণীই নয়, সব বয়সের মানুষের ভালোবাসার বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশের আনুষ্ঠানিক দিবসও। বসন্ত শুধু অশোক-পলাশ-শিমুলেই উচ্ছ্বাসের রং ছড়ায় না, ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তের উপরও রং ছড়ায়। এই বসন্তে বাঙালির দ্রোহপ্রেম আর দেশপ্রেমের অনন্য নজির রয়েছে। ভাষা আন্দোলন-স্বাধীনতা সংগ্রাম এই বসন্তে শুরু হয়েছিল। বসন্ত বাঙালির আত্মজাগরণে জুগিয়েছে সাহস। প্রতিটি বাঙালি এই বসন্তবরণেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক হিসেবে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোক। বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবসের বর্ণিল আভা সারা বছর বিরাজ করুক সকল হৃদয়ে। বাসন্তীয় ভালোবাসায় সিক্ত হোক সকলের অন্তরালোক।

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ: সাংবাদিক, সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ওয়েবসাইটে বাংলা সংস্করণ উদ্বোধন

সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের 'বাংলা সংস্করণ' উদ্বোধন করা হয়েছে। ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১লা জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী 'বাংলা সংস্করণ' উদ্বোধন করেন। ওয়েবসাইট উদ্বোধনের সময় সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. গোলাম রব্বানী, আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সাইফুর রহমানসহ সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট একটি তথ্যবহুল, জনমুখী ও জনবান্ধব ওয়েব পোর্টাল। দেশের জনসাধারণ, বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, আইনের শিক্ষার্থী, গবেষকসহ দেশ ও দেশের বাইরের যে-কোনো ব্যক্তি এ ওয়েবসাইট থেকে সুপ্রিম কোর্টের মামলা সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্য পেতে পারেন।

প্রতিবেদন: ওয়াহিদ হাসান

জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সুন্দরবন

সুরাইয়া শিমুল

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বা গরান বনভূমি সুন্দরবন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন অঞ্চল। মূলত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণাংশজুড়ে বিস্তৃত এই বনটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইউনেসকো কর্তৃক সুন্দরবনকে ১৯৯৭ সালে প্রাকৃতিক 'বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল' ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের জাতীয় পশু বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ এই বনে ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪০০ প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩৩০ প্রজাতির সাপ রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হরিণ, বানর, কুমির, অজগর, রাজগোখরা, কচ্ছপ, উদবিড়াল, কাঁকড়া, বন্য শুকর, বনমোরগ, মাছরাঙ্গা, হাঁসপাখি, শুশুক এবং ঈগল ও শঙ্খচিলসহ বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য পাখি। সুন্দরবনের বিভিন্ন খাল থেকে বছরে নানান প্রজাতির প্রায় ২০ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়ে থাকে। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া ও গোলপাতা উল্লেখযোগ্য।

দুবলার চরের বাৎসরিক মেলা ও বনবিবির মেলার মতো উৎসবসমূহ এখানে অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবনের স্পটসমূহের মধ্যে নারিকেলডাঙ্গা, হাড়বাড়িয়া, জোড়শিং, আংটিহিরা, শেখেরটেক, কালিরচর, চান্দেশ্বর, মালঞ্চ, হরিনগর, কটকা, কচিখালী, নীলকমল (হিরণ পয়েন্ট), করমজল, তিনকোনা, আলোর কোল ও দুবলারচর অন্যতম। মংলা থেকে করমজলের দূরত্ব ১০ কিমি.। এর অদূরে ঢাংমারী। সেখানে একটি ইকোপার্ক ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার রয়েছে। সুন্দরবনে যেতে মংলা থেকে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। পুরো সুন্দরবনজুড়ে রয়েছে অসংখ্য খাল। এ সকল খালের মধ্য দিয়ে ইঞ্জিনবোট বা কোনো নৌযানে যাওয়ার পথে অনেক সময় ডাঙ্গায় কুমিরকে রোদ পোহাতে দেখা যায়। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য হরিণ ও বানরের অবাধ বিচরণ লক্ষ করা যায়। সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহকারী বাওয়ালী, মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালসহ জেলেদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ রয়েছে। গরান বনভূমির অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য যে-কোনো পর্যটককে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত করবে। সুন্দরবনের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাণী ও পাখির কথা তুলে ধরা হলো।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

হলুদের উপর কালো ডোরাকাটা দাগ। সারা শরীর হালকা লোমে ঢাকা। লেজেও গোলাকার রিং পরানো দাগ, দুটো ভীষণ রাগী চোখ, নাকের পাশে খাড়া-খাড়া কয়েকটা গোঁফ, দেখতে ভয়ংকর এই প্রাণীটির নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আমাদের জাতীয় পশু। আমাদের গর্ব। বাঘ ভীষণ চতুর এবং শিকারি। শিকার ধরার জন্য এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে এবং সুযোগ বুঝে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকস্মিকভাবে। এরা মাংসভোজী প্রাণী। কাঠ চোরদের হাত থেকে সুন্দরবন রক্ষা করছে এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

চিত্রা হরিণ

সাদা চঞ্চল, ডাগর চোখের চিত্রা হরিণ সুন্দরবনের অলংকার। গাঢ় বাদামি লেজের উপর সাদা ফোঁটার সমাহার সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এরা দলবেঁধে বনভূমিতে বিচরণ করে। পুরুষ হরিণের শিং গজায়। এরা মূলত ঘাস আর কচি কেওড়ার পাতা খায়।

বানর

বানর বাংলাদেশের অন্যতম বণ্যপ্রাণী। দেশের সবগুলো বনাঞ্চলসহ সুন্দরবনে এদের বেশি দেখা যায়। এরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে চলাফেরা করে। কখনো নদী বা খালের ধারে যায়। সুন্দরবনের কেওড়া ফল বানরের অতি প্রিয় খাবার। এদের দুষ্টুমি, নানান অঙ্গভঙ্গি বনভূমিকে চঞ্চলমুখর করে তোলে। হরিণের সাথে রয়েছে বানরের চমৎকার সখ্যতা। বানর গাছের উপরে বসে কু-কু করে ডাকলে হরিণ গাছতলায় যায়। আর বানর তখন পাতা ছিঁড়ে ফেলে দেয় হরিণের খাবারের জন্য। এছাড়া বাঘ এলে বানর শব্দ করে হরিণকে সতর্ক করে দেয়।

কুমির

কুমির অনেকটা খেজুর গাছের মতো দেখতে। খাঁজ কাটা শরীর। দুই জোরা পা, লম্বা লেজ, লম্বা চোয়াল এবং মাথার উপর দুটো চোখ। এরা পানিতে থাকে। ডাঙ্গায় উঠে শরীরে রোদ লাগায়। কুমির ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে। সুন্দরবনের ২০০ বর্গমাইলের নদী-খাল আর খাড়িতে থাকে কুমির।

সুন্দবনের পাখি

সুন্দরবনের পাখিদের মধ্যে রয়েছে বক, সারস, ডাহুক, পানকৌড়ি, হরিয়াল, ঘুঘু, কবুতর, কোকিল, মাছরাঙ্গা আর কাঠঠোকরা। এছাড়াও শীতের সময় সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসে প্রায় ২০০ প্রজাতির অতিথি পাখি। এদের মধ্যে রয়েছে হারগিলা, সরালি, হাঁস আরও কত পাখি।

বাবুই

বাবুই পাখিকে বলে শিল্পীপাখি। নিপুণ শিল্পীর মতো খুব সুন্দর করে এরা ঘর বাঁধে। তাল, খেজুর গাছে উলটা ফুলদানির মতো এদের বাসাগুলো ঝুলতে থাকে। তাল-খেজুরের পাতার আশ দিয়ে চমৎকার বুনোনি করে ২ ধরনের বাসা বানায় এরা। একটা ডিম দেওয়ার জন্য, আরেকটা দোল খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যার আগে একটু কাদা এনে বাসার ভেতরে লাগিয়ে রাখে। জ্বলন্ত জোনাকির মাথা কাদায় গুঁজে দিয়ে এরা ঘরে আলো জ্বালায়।

ফুলঝুরি

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো পাখি হলো ফুলঝুরি। এরা ভীষণ চঞ্চল। খোলা মাঠ, বাগান সবখানেই এদের দেখা যায়। এদের শরীর হালকা জলপাই আর ধূসর সাদাটে বর্ণের হয়। এরা লম্বায় দেড় ইঞ্চি ওজনে মাত্র ৫ গ্রাম।

বন্যপ্রাণীরা পৃথিবীর, প্রকৃতির পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা সবাই আমাদের বন্ধু। তাই বন্যপ্রাণী হত্যা করলে ১২ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আমরা কখনোই বণ্যপ্রাণীদের শিকার করব না। ভয় দেখাবো না। এতে করে পুরো বাংলাদেশটাই এক সময় বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে।

সুরাইয়া শিমুল: প্রাবন্ধিক

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাসগৃহ নির্মাণ

প্রথম পর্বে পাঁচ হাজার বাসগৃহ 'বীর নিবাস' পেলেন পাঁচ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর নিবাসের চাবি তুলে দেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বীর নিবাসের চাবি হস্তান্তর উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নড়াইল, মাদারীপুর, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ– এ পাঁচ জেলার জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বীর নিবাসের চাবি তুলে দেন। এ পাঁচ জেলাও অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এরই মধ্যে পাঁচ হাজার বীর নিবাস (মুক্তিযোদ্ধাদের বাসগৃহ) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সেগুলোর চাবি হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৭ হাজার ৬৬০টি বীর নিবাসের নির্মাণকাজ চলমান। একতলা বিশিষ্ট প্রতিটি বীর নিবাসের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ লাখ ১০ হাজার ২৮২ টাকা। উল্লেখ্য, 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করা হবে।

প্রতিবেদন: বিদিতা ঘোষ

ফেব্রুয়ারির একুশ মানে

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

এই বাঙালি পৃথিবীতে সেই ভয়হীন জাতি
মাতৃভাষা রাখতে যাঁরা ফুলায় বুকের ছাতি
পিচঢালা পথ রক্ত দিয়ে
নির্ভয়ে সে দেয় রাঙিয়ে
ভাষার দাবি তবু তাঁরা ছাড়লো না একচুল
রক্ত দিয়ে রাখলো শেষে ভাষাকে বিলকুল।

সেদিন ছিল বাহান্ন সাল, ফেব্রুয়ারির মাস
একুশ তারিখ তপ্ত পথে পড়ল ভায়ের লাশ
সেই সে লাশের রক্তবানে
সব বাঙালির প্রাণে প্রাণে
ভাষার দাবি আরও বেশি হয় যে প্রবলতর
জনস্রোতে স্বৈরাচারও কাঁপলো থরথর।

বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা– এইতো সবার দাবি
উর্দুভাষীর অত্যাচারে আর খাবো না খাবি
সেই দাবিতে সবাই জাগে
প্রাপ্যটুকুও চাই যে ভাগে
কোনো রকম বঞ্চনাকে মানবোই না আর
সেদিন থেকেই ফেব্রুয়ারি সবার অহংকার।

ফেব্রুয়ারির একুশ এলে সাহস বাড়ে মনে
বাংলা ভাষার মাধুর্য-রস ছড়াই প্রাণে প্রাণে
এই ভাষাতে লিখি-পড়ি
জীবনজয়ের স্বপ্ন গড়ি
মায়ের ভাষার মর্যাদাকে সবার সেরা ভাবি
ফেব্রুয়ারির একুশ মানে স্বাধীনতার দাবি।

একুশ

রোকসানা গুলশান

আজ বসন্তে জেগেছে প্রাণের
শাশ্বত শহিদমিনার।
পায়ে পায়ে প্রগতি পদযাত্রায়
সব পথ মিশে এক।
ফুল-অঞ্জলির শোকগান শুনি
'আমি কি ভুলিতে পারি?'

দিকে দিকে ফুটেছে অক্ষর
সালাম-বরকত, রফিক-জব্বার, শফিউরের
রক্তের মতো দামি।
দূর আকাশের তারারা যেন
পৃথিবীর বর্ণমালা,
ফেব্রুয়ারির অম্লান উজ্জ্বল রঙে আঁকা।

ভাষা হয়ে যায় আশা, নদীর মতো নিরবধি,
সুচেতনা-স্বচ্ছতা সেতুর পারাপার।
সাদাকালো সৌহার্দ্য চির সমন্বয়ের বাণী,
অনুভবের মুক্ত অভিধান।
শপথের দৃপ্ততায়– স্নেহমাখা উচ্চারণে চলো
জাগ্রত আত্মপরিচয়ে সবে ফিরি।

একুশ আমার শক্তি সাহস, একুশ আমার প্রাণ
বাংলা মায়ের মর্যাদারই ভাষার জয়গান।

বুলি কেমনে গো যাই ভুলি

অলিতাজ মনি

যে ভাষাতে আতিথ্য সমস্ত আকাশটাজুড়ে
গাই, বেড়াই সুরে উড়ে উড়ে;
যে ভাষাতে দূরের দেশের জগৎটাকে পড়া
নয়ন-নীড়ে বেশ তো নড়াচড়া;
যে ভাষাতে অন্দরের অন্তরে অভিলাষ পুষি
যতনে যেমন যত ইচ্ছে খুশি;
যে ভাষাতে মেঘ মাটির মনন কবিতা-ছড়া
মর্মের খননে দহনে সদা গড়া;
যে ভাষাতে দুর্গম দুর্জয় অথই অর্ণবে তরি
পরমের পথেই অভিযান করি;
যে ভাষাতে নীরবে কলরবে ভাই বন্ধু বুঝি
শত্রু হোক তারে সমকক্ষ যুঝি;
যে ভাষাতে মগজে মজে আমরা সর্বে সবাই
নাই আমাদের ভেদাভেদ নাই;
যে ভাষাতে ফুল ফোটে; ফসল ছড়িয়ে ঘ্রাণে
সকল ধকল জানে সুখি আত্মত্রাণে
যে ভাষাতে অনুভূতিতে জাগে– মুগ্ধতার মূল
অনুভবে শুনি নিজের করা ভুল
যে ভাষাতে একের জন্যে অন্যে চক্ষু ভাসাই
ভাষা তো আমার সহোদর ভাই;
যে ভাষাতে মায়ের মনে সায়– নিবিড় নাড়ায়
সান্ত্বনা সন্তান হয়ে ঠাঁই দাঁড়ায়
যে ভাষাতে পাঁজর ঝাঁঝর প্রাণের রক্ত ঢেলে
গড়তে লড়তে ছোটে দামাল ছেলে
যে ভাষাতে খ্যাপা মনের পতিত পথকে খুঁজি
বিশ্বাসে বিশুদ্ধ আকাশ সোজাসুজি;
যে ভাষাতে আমার দুটি হাতে সুদীর্ঘ প্রার্থনা
স্রষ্টা সহায় বক্ত বুকের বন্দনা।

কাঙ্ক্ষিত মুখ

রীনা তালুকদার

উচ্ছল ফাল্গুনের রাত
সুনসান পিনপতন নীরব
মোবাইল ম্যাসেজ টোনে ভাঙলো ভারী ঘুম
বিরক্তির ত্রস্ত পদে ব্যস্ত বাড়াই হাত
ফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখতেই
প্রশান্তি এল নেমে হৃদয়জুড়ে
গুচ্ছ গুচ্ছ গাদাফুলে হাসিমাখা কাঙ্ক্ষিত মুখ
মুক্তঝরা সেই হাসিতে আঁকা ছিল
সালাম-জব্বার-রফিকের বিপ্লবী মুখ।

মায়ের মুখের মধুভাষা

কামাল বারি

এ দেহে বাংলা মায়ের রক্তস্রোত
কণ্ঠে মায়ের ভাষা বাংলা–
বাংলা বর্ণমালার গান;
বাংলা ভাবে বসন্ত বর্ষা ছয় ঋতুতে সমান প্রেমী–
রোদ বৃষ্টি ঝড় জোছনায় সমান ঝুঁকে থাকা বাংলায়;
আহা, বাংলার সুকৃতি সুন্দর মানচিত্র!
দুঃখিনী মায়ের অশ্রুজলে ভেজা
সাহসী ভায়ের রক্তে লাল– উর্বর এই ভূমি;

এ পাহাড় সমুদ্র নদী সমভূমে সাম্যের সূর্য জ্বলে;
আহা, কী দারুণ কাব্যগাথায় শৌর্যে বীর্যে বাংলা!

মায়ের মুখের মধুভাষা
উত্থানের মর্মবাণী–
এই ভাষা মহাবর্ম
মহাশক্তির আধার জানি।

ফাগুনের আগুন

সপ্তিকা চক্রবর্তী

আগুনের সেই অম্লান শিখা ফাগুনে সাক্ষী রক্তে লেখা,
আলোর মিছিলে দামাল সৈনিক, সাক্ষী সকল বৃক্ষ শাখা।
করিতে ভূমির ত্রাণ চলে যায় যাক প্রাণ দুঃসাহসী সেই বীর,
মুক্তির বায়ু বেগবান আজি নিশ্বাসে সুস্থির।
এসেছে আবার ফাগুনের গান কবিতায় চেতনার বাণী,
নৈঃশব্দ্য যেন পৃথিবীর প্রাণে স্মরণেতে কার হাতছানি।
রক্ত কালিতে সিক্ত রাজপথে ইট বালুকার কণা,
কেটেছে আঁধার তবু যেন কাঁদে সেই আপনজনা।
বসন্ত বাহারে আজ এ ফাগুনে সেদিনের বার্তা আনে,
গিয়েছিল আমার শহিদ ভাইয়েরা কত যে মায়ার টানে।
একুশ জানায় সবারে কাঁদায় ডেকেছিল এদেশ তারে,
ফিরবে আবার আসছে ফাগুনে বাংলা মায়েরই দ্বারে।
কুড়িয়ে আনা শ্রদ্ধায় গাঁথা ফুলেরই মালা হাতে,
দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় তারই আগমনে একুশ সূচনা প্রাতে।

ভাষার জন্য শহিদ

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

অ-আ ক-খ বর্ণমালা সব বাঙালির প্রাণ,
বাংলা ভাষায় মাকে ডাকি
রংতুলিতে ছবি আঁকি
মনের ভেতর ভালোবাসার মিষ্টি ফুলের ঘ্রাণ।

কবি লেখে গান কবিতা ছড়া,
আকাশজুড়ে লক্ষ তারার দুচোখ আলোয় ভরা।
বর্ণমালার আগুন ছড়ায় কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
মিছিল চলে এই জনতার বাহান্নর ঐ সালে।

বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা
বীর বাঙালির মনের আশা
প্রতিবাদে রাজপথে সব মশাল হাতে কারা,
রক্ত দিল দামাল ছেলে
হাসি মুখে কেউবা জেলে
আজও অমর আনতে ভাষা রক্ত দিল যাঁরা।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা

খোরশেদ আলম নয়ন

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
সোনার চেয়ে দামি,
এই ভাষাকে সবার চেয়ে
ভালোবাসি আমি।
ফুলের বুকে জড়িয়ে সুবাস
পাখির ঠোঁটে গান
নদীর বুকে ঢেউ দোলানো
হাওয়ার কলতান;
সবার মাঝে পাই যে খুঁজে
একটি বীণার সুর,
সে যে আমার বাংলা ভাষা
স্বপ্ন সুমধুর।

পলাশ বনে ফুটছে পলাশ
ফুটবে শিমুল লাল
আমার মায়ের মুখের ভাষা
থাকবে চিরকাল।

স্বর ও শাস্ত্র

মনির জামান

তুমি 'ও' বললে আমি 'ঐ' হয়ে যাই
ঐ ইয়ে মানে পাগল দিওয়ানা
স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জণবর্ণের এক গোলকধাঁধা
'ব' আর 'ভ' ঠোঁটে এসে তালগোল পাকায়
বিদ্যাসাগরীয় বর্ণের জটিলতা এই আর কী!
খুব সহজে বুঝে নাও তুমি, আমার থাকে বাকি।
অর্থের ভিন্নার্থই বানায় পার্থিব সৌভাগ্য;
স্বরই যখন শাস্ত্র
তখন কণ্ঠকে খুঁজতে আসার অভিপ্রায়ে
সোনালু ফুলের দুল কুড়াই,
আকাশকে পরাই নীল শাড়ি
টিপ বানাতে শেষে মাঠের সবুজ করি কর্জ
রুপালি নদীর ফিতে দিয়ে বাঁধি মেঘের এলোকেশ
পরার্থে জীবন এও কী সম্ভব মাথাটা গ্যাছে একদম শেষ!
এই আমাকে দিয়ে না কিচ্ছুটি হবে না
যখন ভালোবাসার নাম দিয়েছি নীরবতা
চাঁদকে ডাকি দূরতমা বলে, কৌমুদী সরলা
চোখের সায়রে ফুটে ওঠা সাদা গোলাপি শতদল
প্রজাপতির পাখা যত আমার হাতেই আঁকা
তুমি চন্দ্রের পর বিন্দু লাগিয়ে কলঙ্ক বাড়াও,
চাঁদকে বলো বাঁকা!

নিরাপদ খাদ্য রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ

নাজমুন নাহার

'নিরাপদ খাদ্য সমৃদ্ধ জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো ২রা ফেব্রুয়ারি পালিত হয় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি হাতে নেয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, যা তার বেড়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। আর খাদ্য যদি নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪, ৫, ৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ অনেক খাদ্য ব্যবসায়ী খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর মাধ্যমে কালমুড়ি, ফুচকা, সমুচা, রোল, সিঙ্গারা, পেঁয়াজু, জিলাপি, পরোটা ইত্যাদি পরিবেশন করছেন, যা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এ ব্যবহৃত কালিতে ক্ষতিকর রং, সিসামেন্ট ও প্রিজারভেটিভস থাকে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া পুরনো কাগজে রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবও থাকে। খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর ঠোঙ্গায় বা টক কাগজে মোড়ানো খাদ্য নিয়মিত খেলে, মানবদেহে ক্যানসার, হৃদরোগ ও কিডনীরোগসহ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এমতাবস্থায়, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ অনুসরণ করে পরিষ্কার ও নিরাপদ ফুডগ্রেড পাত্র ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি তার মেধা বা মননশীলতারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সাথে খাদ্যের নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুস্থ-সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপকল্প– ২০২১ ও রূপকল্প–২০৪১ এবং ডেলটা প্ল্যান–২১০০ প্রণয়ন করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন 'পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯' রহিত করে ২০১৩ সালের ১০ই অক্টোবর যুগান্তকারী 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' প্রণীত হয়। আইনটি ২০১৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) সর্বসাধারণকে জানানো এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। দিবসটি উপলক্ষে ২রা ফেব্রুয়ারি বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্তত ৭টি লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরাপদ খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, খাদ্যের উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান বজায় রাখা জরুরি। যিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তার যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি যিনি ভোগ করবেন, তার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা প্রত্যয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ৩টি বিধি ও ৯টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার নিমিত্তে খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য

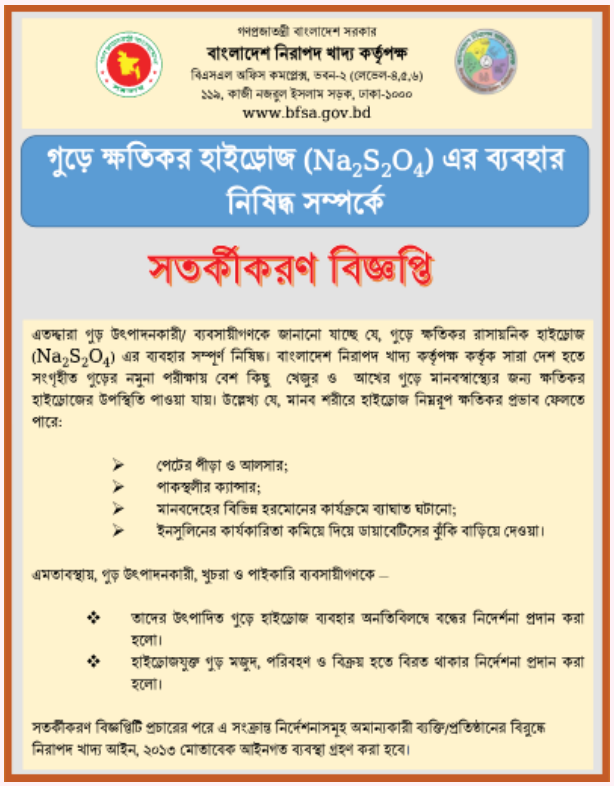

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪,৫,৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

গুড়ে ক্ষতিকর হাইড্রোজ ($Na_2S_2O_4$) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কে

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা গুড় উৎপাদনকারী/ ব্যবসায়ীগণকে জানানো যাচ্ছে যে, গুড়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক হাইড্রোজ ($Na_2S_2O_4$) এর ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সারা দেশ হতে সংগৃহীত গুড়ের নমুনা পরীক্ষায় বেশ কিছু খেজুর ও আখের গুড়ে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হাইড্রোজের উপস্থিতি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মানব শরীরে হাইড্রোজ নিম্নরূপ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে:

- পেটের পীড়া ও আলসার;
- পাকস্থলীর ক্যান্সার;
- মানবদেহের বিভিন্ন হরমোনের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটানো;
- ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়া।

এমতাবস্থায়, গুড় উৎপাদনকারী, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীগণকে –

- তাদের উৎপাদিত গুড়ে হাইড্রোজ ব্যবহার অনতিবিলম্বে বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
- হাইড্রোজযুক্ত গুড় মজুদ, পরিবহণ ও বিক্রয় হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের পরে এ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ অমান্যকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার ইতোমধ্যে ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশের সকল জেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ৬৪ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা পদায়ন করে জেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা, মনিটরিং ব্যবস্থা ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে সারা দেশে কর্মশালা, সেমিনার, ক্যারাভান রোড শো, পাবলিক মিটিং আয়োজন, পথনাটক, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট, গণবিজ্ঞপ্তি, উঠান বৈঠক, বাল্ক মেসেজ, টিভি স্ক্রল, প্যাম্পলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ, বিভিন্ন স্কুলে হাত ধোয়াসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১২টি টিভিসি নির্মাণপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ৮টি টিভিসি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মোট ৯০৮ মিনিট প্রচার কারা হয় এবং ৪টি গণবিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন সময়ে মোট ৬৩টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারা দেশব্যাপী ৪৪৮টি ক্যারাভান রোড শো এবং সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে গৃহিণীদের মধ্যে খাদ্য নিরাপদ রাখার চর্চা বৃদ্ধিতে দেশব্যাপী উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৪৭৯ জন এবং ৮০০ জন হোটেল-রেস্তোঁরার খাদ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কাজটি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে সব জেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান। ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নিয়মিতভাবে সারা দেশে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএফএসএ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১৬৮টি এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১৬৮৯টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়। বিএফএসএ কর্তৃক ডেজিগনেটেড স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দ্বারা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯৭৯৬টি এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫৮২৫টি খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা হয়।

খাদ্যে ভেজালকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষ্যে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়, যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৪৬ জন, মামলা সংখ্যা ১৪৬টি এবং সর্বমোট অর্থদণ্ড করা হয় ২,০৯,০০,০০০ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৮০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়, যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭৪ জন এবং সর্বমোট অর্থদণ্ড করা হয় ১,০৫,০০,০০০ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬২৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়, যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৪৫ জন, মামলার সংখ্যা ২৩১৪টি, নিয়মিত ৩টি, কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ১৩৩ জনকে এবং অর্থদণ্ড করা হয় ২,৪৭,২০,০২০ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬০৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়, যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭৩৬৮ জন, মামলার সংখ্যা ৭৩৪৮টি। কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ২ জনকে এবং অর্থদণ্ড করা হয় ১,৯১,৫১,১৭৮ টাকা।

নাজমুন নাহার: প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ দিবস পালন

কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণের এসবিআই অডিটোরিয়ামে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের পরিসর বাড়ানোর দাবি জানায় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। সমিতির সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'কলকাতা বইমেলায় বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নের ভিড়ই বলে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশি বইয়ের পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। এতটাই ভিড় হয়েছে যে স্টলগুলোতে দাঁড়িয়ে বই নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ নেই।'

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সুভাষ সিংহ রায়, ভারতের বীথি চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস।

প্রতিবেদন: ইশরাত হোসেন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/মগের জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

একুশ তুমি

আবু তৈয়ব মুছা

একুশ তুমি নও তো শুধু
তারিখ লেখার একুশ,
একুশ তুমি মুখের ভাষা
অ-আ বলার একুশ।

একুশ তুমি স্বাধীনতার
সামনে চলার পথ,
একুশ তুমি শহিদ সালাম
শফিউর, বরকত।

একুশ তুমি মুক্তাকাশে
ফাগুন ঝরা আগুন
একুশ তুমি রক্তে ভেজা
স্বাধীনচেতা তরুণ।

একুশ তুমি বিশ্বসেরা
কথা বলা স্বর,
একুশ তুমি ইতিহাসে
আছ অবিনশ্বর।

একুশ তুমি আলোয় আসা
আমার মায়ের মুখ,
স্বপ্ন বুনি স্বাধীনতার
সেই আলোতে
হারায় সকল দুখ।

একুশ তুমি সারা বিশ্বে
শিশু শিক্ষার পাতা,
একুশ তুমি মা জননীর
মুখের প্রথম কথা।

একুশ তুমি মনের মাঝে
স্বাধীনতার কিনার,
পাক শাসকের জুলুম বাজে
রক্তে ঢালা মিনার।

একুশ আমার

ইশরাত আরা দ্যুতি

একুশ আমার
হাজার পাখির কিচিরমিচির ডাক
একুশ আমার সমুদ্র স্রোত, ভরা নদীর বাঁক।

একুশ আমার
মাকে যেন মা বলেই ডাকা
একুশ আমার গ্রামবাংলার পথটি আঁকাবাঁকা।

একুশ আমার
বাংলা ভাষায় নিজের মতন বলা
একুশ আমার
বাংলাদেশে নিজের মতন চলা।

একুশ আমার
মায়ের কাছে চাঁদের গল্প শোনা
একুশ যেন
তোমার আমার স্বপ্নের জালবোনা।

একুশ আমার
বাংলা মায়ের সোহাগভরা বুলি
একুশ যেন
হাজার মায়ের দামাল ছেলের খুলি।

একুশ আমার
দিঘির জলে ফোটা পদ্মফুল
একুশ আমার
উদার আকাশ, শিমুল পলাশ ফুল।

একুশ আমার
নতুন করে আবার ফিরে চাওয়া
একুশ যেন
নতুন করে বাংলাতে গান গাওয়া।

একুশ আমার
দেশবাসীর লক্ষ কোটি আশা
একুশ আমার
দেশের প্রতি আবেগ ভালোবাসা।

একুশ যেন
হাজার শিশুর মুক্তো ঝরা হাসি
বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা
তোমায় ভালোবাসি।

একুশ আমার মায়ের ভাষা

শাহাদত হোসেন সুজন

একুশ আমার মায়ের ভাষা
সর্বজনে কয়,
ফাল্গুন মাসে শিমুল ডালে
হুতাসন বাতাস বয় ...

উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা
একি কথা কয়!
পাকিস্তানিদের এহেন আবদার
পরানে আর সয়?

রুখে দাঁড়ায় দামাল ছেলে
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,
সবাই এবার বুঝে গেছে
ওদের সকল ভনিতা।

রফিক-সালাম-জব্বার-শফিক
ভাষার তরে দিল পরান,
জেগে ওঠে শহিদমিনার
স্মৃতিতে অম্লান।

বেজায় পাজি জিন্নাহ সাহেব
এতদিনে গেছে বুঝে,
বীর বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছে
পালায় পথ খুঁজে ...।

আনতে গিয়ে মায়ের বুলি

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

আনতে গিয়ে মায়ের বুলি
ভাষাসৈনিক ভাই
বাহান্নতে সেই যে গেল
আর তো ফিরে নাই।
পাকসেনারা মারছে গুলি
হঠাৎ কারও উড়ল খুলি
রাজপথ হয় লাল
মায়ের বুলি সেই থেকে পাই
বাংলা ভাষার মর্যাদা তাই
থাকবে চিরকাল।
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা
গর্বে ভরে বুক
এই ভাষাতে কথা বলে
পাই যে মনে সুখ।

চমকানো সেইদিন

ফরিদ সাইদ

ফাগুন এলেই মনে ভাসে
হাত উচানো সিন
মনে পড়ে মনের কাচে
চমকানো সেইদিন।
রং ছড়ানো পথে
চলল আলোর রথে
প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে
এগিয়ে ছিল কারা ?
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে
সামনে এল যারা।
স্মৃতির মিনার
স্মৃতির মিনার
তোমার কাছে ঋণ
আমার মুখের মায়ের ভাষা
বাজাই সুখের বিন।

জ্ঞানের আলো

বিচিত্র কুমার

জ্ঞানে গুণে নামে যশে
মানুষ হতে ভাই
বই-কলম হাতে নিয়ে
পাঠশালাতে যাই।

বইয়ের পাতায় জ্ঞান-আলো
আমরা গ্রহণ করি,
বই আমাদের পরম বন্ধু
সুখের জীবন গড়ি।

দেশ-বিদেশের কত পড়া
আশার প্রদীপ ভাই
জীবন হবে মধুর যদি
জ্ঞানের দেখা পাই।

একুশ

আফরোজা পারভীন

রুমার বাম হাত নেই। নেই মানে সত্যিই নেই। কনুইয়ের নীচ থেকে কব্জি পর্যন্ত নেই। বাম হাত না থাকায় রুমাকে সব কাজই করতে হয় ডান হাত দিয়ে। এছাড়া যে তার উপায় নেই। রুমা মাঝে মাঝে ভাবতো, ভাগ্যিস বাম হাতটা কাটা গিয়েছিল। ডান হাত কাটা গেলে সে লিখতে পারত না। অবশ্য ওই ভাবনাই সার। ওই অপরিপক্ব ভাবনাটা সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। নিজে নিজেই বুঝে নিয়েছে এখন সে যেভাবে ডান হাতে বাম হাতের কাজ সারছে ডান হাত না থাকলে সে বাম হাতেই ডান হাতের কাজ সারত। অনেক লোক আছে যারা ডান হাত থাকা সত্ত্বেও বাম হাতে লেখে। ছেলেবেলায় শিপ্রাকে দেখত বাম হাতে লিখতে। শিপ্রা কখনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয়নি। জলজ্যান্ত ডান হাত থাকা সত্ত্বেও বাম হাতে বল আর ব্যাট করে এ দেশের রফিক, ভারতের যুবরাজ আর ইরফান পাঠান। গাঙ্গুলি অবশ্য সমতা রেখে চলে। সে কোনো হাতের প্রতি অবিচার করতে রাজি নয়। তাই সে বল করে ডান হাতে, ব্যাট ধরে বাম হাতে। আরও আছে। পুরো প্যারালাইজড শরীরে সচল দু'তিনটে আঙুল নিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন্স হকিন্স *অ্যা ব্রিফ হিস্টিরি অব টাইমস* -এর মতো বই লিখে চলেছেন একের পর এক, দাপটের সাথে। আসলে কোনো কিছু না থাকার ক্ষতি প্রকৃতি কেমন ভাবে যেন পুষিয়ে দেয়। প্রকৃতি বড়ো সদয়, তাই বামহাত না থেকে ডান হাত থাকাতে ভালো হয়েছে কিংবা ডান হাত না থেকে বাম হাত থাকলে ভালো হতো এগুলো কোনো কথা নয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে রুমার একটা হাত নেই এটাই ক্ষতি, কোন হাতটা নেই সেটা বিবেচ্য বিষয় না।

হাত থাকা না থাকা নিয়ে তেমন তাপ উত্তাপও ছিল না রুমার। বরং মনে ছিল তীব্র অহংকার। সাথে ক্ষীণ জ্বালাও ছিল, ছিল জিজ্ঞাসা, এ লড়াই কবে শেষ হবে! হাসপাতালে নেওয়ার পর যখন ডাক্তার পরীক্ষা করে অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন রুমার বাম হাতটা কেটে ফেলতে হবে তখন একযোগে কেঁদে উঠেছিলেন রুমার বাবা-মা। রুমার বাবার কান্না হাহাকারের মতো শুনাচ্ছিল আর মার কান্না আর্তনাদের মতো। মনে হচ্ছিল তাদের কলিজা বুঝি উপড়ে ফেলছে কেউ। রুমার তখন নিজের হাতের জন্য নয়, কষ্ট হচ্ছিল বাবা-মায়ের জন্য।

মা আর্তনাদ করতে করতে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন,

–ডাক্তার সাহেব আর একবার ভালো করে দেখেন আমার মেয়ের হাতটা বাঁচানো যায় কিনা। আমার ঐ একটিই সন্তান। তাছাড়া মেয়ে বলে কথা! হাত না থাকলে এ সমাজে ও টিকে থাকবে কী করে!

ডাক্তারের কণ্ঠ এবারও ছিল অকম্পিত। শুধু অকম্পিত নয়, নিদারুণ নির্লিপ্ত। শীতল কণ্ঠে বলেছিলেন,

–ছেলেমেয়ে বলে তো কথা না। কথা হচ্ছে হাত নিয়ে।

–কিন্তু মেয়েদের পরের ঘরে যেতে হয়। হাত না থাকলে ...

মা কথা শেষ করেননি। ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন,

–আপনি আর একবার একটু ভালো করে দেখেন।

–আমি যখন দেখি ভালো করেই দেখি, বারবার দেখতে হয় না। মেয়েকে অনেক দেরিতে আমার কাছে এনেছেন। অনেক আগেই হাড়ে পচন ধরেছে। এখন হাত রাখতে হলে মেয়েকে হারাতে হবে।

–না , না , কিছুতেই না, যুগপৎ আর্তনাদ করে উঠেছিলেন বাবা-মা।

এক হাত নিয়ে বাড়িতে ফিরেছিল রুমা। বাবা-মা রুমার চলাফেরা, গতিবিধির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। যে নিষেধাজ্ঞার আওতায় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান রুমা কখনই ছিল না। কিন্তু রুমা মানেনি কোনো নিষেধাজ্ঞা। দেশের প্রয়োজনে ঘর ছাড়তে তৈরি ছিল সে। তাই বাবা-মা বাধ্য হয়েছিলেন নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে। আর রুমাকেও দেখা গেছে মিটিং-মিছিল আন্দোলনে প্রথম সারিতে। এ আন্দোলনে এক হাত না থাকা কোনো সমস্যা করেনি। বরং রুমা যখন তার কাটাহাত উত্তোলিত করেছে তখন আন্দোলনে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

কিন্তু লেখাপড়া আন্দোলনের বাইরেও রুমার একটা জীবন ছিল। সে জীবন নিয়ে রুমা না ভাবলেও বাবা-মা না ভেবে পারেননি। দেখতে দেখতে মেয়ের বয়স তিরিশ পেরুলো। লেখাপড়া সেই কবে শেষ। চাকরি খুঁজছে। রুমার মুখ-চোখ, চেহারা, রং, বংশ কৌলীন্য বিত্ত দেখে অনেক পাত্রই এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যখনই জেনেছে রুমার এক হাত নেই, তখন নীরবে সরে পড়েছে তারা। কেন রুমার হাত নেই, সে কী জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী নাকি কোনো অসুখ কিংবা এক্সিডেন্টে তার হাত গেছে, নাকি কোনো গৌরবগাথার অংশীদার সে খোঁজ কেউ নিতে আসেনি। অন্যের পঙ্গুত্বের কারণ অনুসন্ধান করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাত্রপক্ষের নেই। আর সময় থাকলেই তারা সময় ব্যয় করবে কেন!

বাবা-মায়ের চোখের নীচে কালি গভীর হয়ে বসেছে। মেয়ের বয়স তেত্রিশে পড়েছে। না বিয়ে না কোনো চাকরি। তা নিয়ে কি মেয়ের কোনো ভাবনা আছে! তা একমাত্র ভাবনার বিষয় দেশ। সে নাকি দেশেরই অংশ। দেশ বাঁচলে সে বাঁচবে, দেশ মরলে মরবে সে। এসব কথায় সায় দিলে গার্জিয়ানদের চলে না। তারা আর কদিন।

বাবা-মা যখন গভীর দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত তখনই আসিফদের তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা এলো। ছেলে ডাক্তার। সরকারি চাকরি করে না, তবে রোজগারপাতি ভালো। আর রোজগার নিয়ে তেমন মাথাব্যথাও ছিল না রুমার বাবা-মায়ের। তাদের অঢেল আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় সতর্ক হয়ে গিয়েছিল রুমার বাবা-মা। কথা বেশি এগুবার আগে নিজেরাই হাত না থাকার বিষয়টা তুলেছিল। কীভাবে মেয়ের হাতটা গেছে সবিস্তারে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু থামিয়ে দিয়েছিলেন আসিফের বাবা। এ বিষয়টাতে কোনো গুরুত্বই দেয়নি আসিফের পরিবার। তাছাড়া এমন নামকরা বাবা-মায়ের সন্তান! এত অর্থ-বিত্ত! এমন মেয়ে কোটিতে একটা মেলে। সুতরাং বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মায়ের মনে একটু খুঁত খুঁত ছিল, এ দেশে আসিফদের কোনো শিকড় নেই। কিন্তু সব কিছু কি আর মনমতো হয়। কিছু না কিছু ছাড় দিতেই হয়। ওরা আগ্রহ করে নিচ্ছে এটাই বড়ো কথা!

বিয়ে নিয়ে রুমার ভাবনা না থাকলেও ভাবনা ছিল চাকরি নিয়ে। এ সমাজে মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো বড়ো জরুরি। তাই লেখাপড়া শেষ করার আগেই চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিল রুমা। এক হাত না থাকার সমস্যাটা রুমা প্রথম উপলব্ধি করল সরকারি চাকরি নিতে গিয়ে। যেখানেই পরীক্ষা দেয় লিখিত পরীক্ষায় এলাউ হয় কিন্তু ভাইভাতে বাদ পড়ে। প্রথম দিকে রুমা বুঝতে পারেনি কারণটা কী? এ নির্মম বিষয়টা বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বুঝলেও রুমার সামনে উচ্চারণ করেনি। বরং বাবা বারবার বলছিলেন,

–তুমি এক কাজ করো মা। একটা বেসরকারি কলেজে চাকরি নাও। বদলির ঝামেলা থাকবে না। সারাজীবন এক কলেজেই চাকরি করতে পারবে। সরকারি যে-কোনো চাকরিতেই তো আজ এখানে কাল ওখানে। সারাক্ষণ বদলির ভয়।

–তা ঠিক, কিন্তু সরকারি চাকরিতে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দুটোই বেশি। তাছাড়া বাবা তুমি ভেবে দেখো পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভালো ভালো সরকারি চাকরিগুলো কুক্ষিগত করে রাখবে আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাবে না, এ কেমন কথা!

–ওসব কথা আর ভেবো না মা। ওসব ভাবতে গিয়েই তো হাতটা খোয়ালে, সারাজীবনের মতো পঙ্গু হলে। আমার একমাত্র সন্তান তুমি, আমার কষ্ট বুঝবে না!

বাবার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। থেমে থেমে বলেন,

–জীবনের সহজ হিসেবগুলো করো মা।

–আচ্ছা বাবা সহজ হিসেবই করছি । সরকারি চাকরি পাওয়া যেমন কঠিন যাওয়াও তেমন কঠিন। বোনাস আছে, পেনশন আছে। বেসরকারিতে ওসব কিছুই নেই।

–তুমি যেটা বলছ ওটাই নিরাপত্তা আর নিশ্চয়তা। কিন্তু রুমা বেসরকারি চাকরিও কথায় কথায় যায় না। আর বোনাস প্রায় সব বেসরকারি চাকরিতেই আছে। পেনশন আজ নেই, একসময় হয়ে যাবে।

বাবার কথায় দু'একটা বেসরকারি কলেজে ইন্টারভিউ দিয়েছিল রুমা। ফলাফল একই। লিখিত পরীক্ষাতে টেকে, ভাইভাতে আউট হয়ে যায়। এমন যখন অবস্থা তখন আরও একটি কলেজের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেয় রুমা। রুমার বিয়েও তখন ঠিক। এ নিয়োগে কোনো ভাইভা হয়নি। রুমার রেজাল্ট ভালো, রিটেনে খুবই ভালো করেছিল। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে এসে যায়। মাত্র ক'দিন আগে বিয়ে হয়েছে রুমার। এক হাতে মেহেদি নিয়েই জয়েন করতে যায় রুমা। প্রিন্সিপাল উৎফুল্ল মুখে তাকে অভ্যর্থনা করেন, হাসেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তার চোখ আটকে যায় রুমার কাটা হাতের ওপর। নিজের অজান্তেই তার ঠোঁট চিরে অস্ফুটধ্বনি বেরিয়ে যায়।

–সেকি আপনার একটা হাতই তো নেই! এমন জানলে তো চাকরিটা...

সেই মুহূর্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় রুমার কাছে। ও এজন্যই বুঝি তার সরকারি-বেসরকারি কোনো চাকরিই হচ্ছিল না!

নেহাত নিয়োগপত্র দেওয়া হয়ে গেছে আর রুমাও জয়েন করে ফেলেছে, তাই চাকরিটা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। নইলে সেটাও ঘটত এটা নিশ্চিত। তবে চাকরিটা থাকলেও ঠিক যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে নেই। সবার চেয়ে সিনিয়র হয়েও রুমা হতে পারেনি বিভাগীয় প্রধান। পদোন্নতিতে কীভাবে যেন তাকে টপকে অন্যরা বারবার এগিয়ে যায়। রুমা বিদ্রোহ করতে পারে, প্রতিকার চাইতে পারে, করে না, চায় না। রুমা এসব দেখে মনে মনে হাসে। অনেক বড়ো ঘটনার প্রতিকার সে চেয়েছিল, প্রতিবাদ সে করেছিল তাই আজ তার হাত নেই। তাই আজ সে যোগ্য হয়েও বঞ্চিত। সবার চোখে অযোগ্য। কিন্তু রুমার এসব বিষয়ে কোনো আক্ষেপ নেই। হাত না থাকার ব্যাপারটা তাকে কখনোই সেভাবে কোনো কষ্ট দেয়নি বরং মনে সুতীব্র গর্ববোধ ছিল বরাবরই যা কখনোই কারো কাছে প্রকাশ করেনি।

সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর স্বামী আসিফকে রুমা বলেছিল,

–দেখ আমাদের প্রথম সন্তান যদি ছেলে হয় তার নাম রাখব একুশ আর মেয়ে হলে ভাষা ।

স্ত্রীর অনেক খেয়ালিপনায় বরাবর সায় দিয়ে গেছে আসিফ। তার সিংহভাগ ভালোবেসে নয় বরং অযথা সময় নষ্ট করতে চায় না বলে। তাছাড়া যে স্ত্রীর অগাধ বিত্ত বৈভব তাকে একটু সমঝে চলতেই হয়। স্ত্রী গাড়ি রেখে হুডখোলা রিকশায় ঘোরে, বৃষ্টিতে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে ভেজে, সাতসকালে জানালা খুলে কুয়াশা দেখে, পাখির কিচিরমিচির শোনে, গভীর রাতে ছাদে বসে তন্ময় হয়ে আকাশের তারা গোনে, এসব দেখেও দেখে না আসিফ। শুধু কি তাই, রুমা বছরের পর বছর শুধু ক্যালেন্ডার জমিয়ে যায়। তাও ভালো ছবি আর আর্টের ক্যালেন্ডার হলে এক কথা। সে জমায় শুধু বাংলা ক্যালেন্ডার। আর প্রতিটি ক্যালেন্ডারের বাংলা ৮ই ফাল্গুন আর ইংরেজি ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সে দাগ দেয়। অদ্ভুত খেয়াল! মানুষ পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তোলে, পাখি পালে, বাগান করে, স্ট্যাম্প, কয়েন, সিডি ক্যাসেট কালেক্ট করে, নানান ধরনের রান্না করে, মহিলারা শাড়ি গহনা ভ্যানিটিব্যাগ জমায় কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়ালের কথা কেউ কখনও শুনেছে! তবুও সব দেখে শুনে চুপ করে থেকেছে আসিফ। সে ডাক্তার মানুষ, এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে সংসারে অশান্তি করে যে সময় নষ্ট হবে সে সময়ে দুটো রোগী দেখলে তার বাড়তি পয়সা আসবে। কিন্তু এবার আর সে নিশ্চুপ থাকতে পারল না। প্রথমে বাধা না দিলে রুমা ধরে নেবে সে যা বলছে তাতেই আসিফ রাজি। সেটা হতে দেওয়া যাবে না। সন্তানের নাম নিয়ে কথা! নাম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহন করতে হয়। অবশ্যই নাম হতে হবে ইসলামি। নিজেকে নিয়ে যা ইচ্ছা করুক রুমা কিন্তু সন্তানকে নিয়ে খেয়ালিপনা চলবে না।

–কি বলছ পাগলের মতো, মানুষের নাম একুশ হয় নাকি? আর ভাষা ওটাইবা কেমন নাম! তাছাড়া সন্তানের নামকরণের জন্য বাবা-মা

আছেন, তারাই রাখবেন।

–ওনারা ভালো নাম রাখবেন তাতে তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ডাকনাম রাখব আমি। তুমি বলছ একুশ কোনো নাম হয় না। কেন হয় না শুনি? একুশ এ দেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এ দেশের স্বাধীনতার প্রথম বীজটি উপ্ত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে রক্ত ঝরেছিল সেই রক্তস্নাত পথ ধরে এদেশে স্বাধীনতা এসেছে। আর স্বাধীনতা এসেছে বলেই তুমি আমি আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। তোমার সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে স্বাধীন দেশে। আর যে কারণে একুশ নাম রাখা যায় সেই একই কারণে ভাষা নামও রাখা যায়।

–কিন্তু

–কোনো কিন্তু নেই আসিফ। ঐ নাম না রাখলে আমার আমিত্বকে অস্বীকার করবে তুমি। এত সহজে সব কথা ভুলে গেলে তুমি! সেই রক্তঝরা ফাল্গুন, ১৯৫২ সাল? আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলল, উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু উইল বি দা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান। সব ভুলে গেলে তুমি!

–রুমা তুমি ভুল করছ, এসব কথা আমার মনে থাকার কথা না। আমরা অরজিনালি এদেশের না।

–ওহ তাইতো, তাই তো, সেটা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম ১৯৬৫-এর পাক ভারত যুদ্ধের পর তোমরা এসেছ এদেশে। ভুলে গিয়েছিলাম তুমি একজন মাইগ্রেটি।

–সেজন্য কি তোমার মনে কোনো দুঃখ আছে রুমা?

–দুঃখ! তা বোধহয় কিছুটা আছে। যাক, জানো না যখন শোনো সে কথা। শোনো ১৯৪৮-এর সেই দিনে জিন্নাহ বলল, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ভাষা মতিন হাত তুলে বললেন, নো নো নো। এর আগে একবার গণপরিষদের অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি সে প্রতিবাদে। তা সেদিন ভাষা মতিনের কণ্ঠে সেই না না ধ্বনি সারা দেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তরের ধ্বনি হয়ে উঠল। ফুঁসে উঠল বাঙালি, শুরু হলো আন্দোলন।

–এসব ইতিহাসের কিছু কিছু আমি জানি।

–না, তুমি জানো না। আর জানলেও তোমার চেতনার মূলে নাড়া দেয়নি সে জানা। নইলে ছেলেমেয়ের নাম একুশ আর ভাষা রাখতে তুমি প্রতিবাদ করতে না। আসিফ তুমি শুধু ডাক্তারিই করেছ, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি পড়েছ। কিন্তু কখনও কি পড়েছ আবু জাফর ওবায়দুল্লার সেই অমর কবিতা, মাগো ওরা বলে/পড়েছ কি হাসান হাফিজুর রহমানের সেই, অমর একুশে/সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার কী বিষণ্ন থোকা থোকা নাম/এই শহীদের বর্ষার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে–পড়নি। তুমি কি জানো প্রভাতফেরিতে কেন পায়ে জুতো পরা হয় না, কেন নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরি হয়? জানো না। জেনে রাখো, সেদিন যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদের সবার পা ছিল নগ্ন। অন্য দেশ থেকে এসে এ দেশি হয়েছ। এ দেশের ভাষা-সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শেখনি। শেখনি করতে এ দেশের শিকড় অনুসন্ধান!

–অনেক হয়েছে রুমা, অনেক বলেছ। এবার থামো। তোমাকে কিছু বলি না বলে..

–বলো না কেন, বলো? শোন আজ আমাকে তুমি থামাতে পরবে না। তুমি কি জানো ২১শে ফেব্রুয়ারির সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা? জানো না। জানলে গর্বে বুক ফুলে উঠত তোমার। নিজেই সন্তানের নাম রাখতে একুশ অথবা ভাষা।

–রুমা তুমি বলতে বলতে অনেক বলে ফেলেছ। শোনো এমন ইতিহাস পৃথিবীর সব দেশেরই আছে, এমন সংগ্রাম পৃথিবীর সব দেশেই হয়।

–হয় মানি। কিন্তু ভাষার জন্য সংগ্রাম এ দেশে ছাড়া অন্য কোনো দেশে হয়নি। ভাষার জন্য রক্ত এ দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশের মানুষ দেয়নি।

–রুমা তোমার এসব কথা শোনার মতো পর্যাপ্ত সময় আমার নেই। আমার পেসেন্টরা বসে আছে।

–হ্যাঁ, সেটাই তোমার জন্য জরুরি। তোমার সাধ্যের দ্বিগুণ তিনগুণ রোগী দেখবে তুমি। রোগীদের এক মিনিট করেও সময় দেবে না। মানিব্যাগ ভরে পকেট উপচে টাকা উথলে উঠবে আর সেই টাকা নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে আসবে।

–কিন্তু এসব কার জন্য করি শুনি? রুমা সারাজীবন তুমি শুধু আমার খারাপ দিকটাই দেখে গেলে। আমি বলে একটা পঙ্গু এক হাতবিহীন মেয়েকে বিয়ে করেছি। বলো দাম্পত্য জীবনে আমি কি পেয়েছি? একজন স্বামীর কি ইচ্ছে হয় না তার স্ত্রী তাকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরুক, তার কি ইচ্ছে হয় না যে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সে পথ চলবে সে হবে একজন পরিপূর্ণ মানুষ? এই যে তুমি মা হতে চলেছ, তুমি কি কখনও পারবে তোমার সন্তানকে দু'হাত দিয়ে কোলে তুলে নিতে? পারবে না। অথচ তোমার মতো একজন অপূর্ণাঙ্গ স্ত্রী নিয়ে আমি জীবন কাটিয়ে দিলাম। এ দুঃখ কি আমার কম!

রুমা থমকে যায়। ও অনেক আগেই বুঝেছিল বাবার টাকার জন্যই হাত না থাকলেও রুমাকে বিয়ে করেছে আসিফ। তবে বিয়ের আগে বোঝেনি এটাই আক্ষেপ। রুমার চোখে বেয়ে পানির ক্ষীণ ধারা নামে। দ্রুত সে ধারা বেগবান হয়। চোখের পানি পায়ের কাছে জমা হতে থাকে। চোখে পানি নিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে আসিফের দিকে মুখ তুলে তাকায়। কণ্ঠে দৃঢ়তা।

–দুঃখ করো না আসিফ, গর্ব করো। কারণ তোমার স্ত্রী তার হাত হারিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির সেই ভোরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে ব্যারিকেড টপকাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে। সে জন্মগত প্রতিবন্ধী নয়, ভাষাসৈনিক। তোমার সন্তানকে তার মা দুহাতে কোলে তুলে নিতে পারবে না সত্যি কিন্তু দিতে পারবে ভাষাসৈনিকের উত্তরাধিকার।

এরপর এক সকালে রুমার ছেলে জন্মায়। রুমা এক হাতে তাকে উঁচু করে বলে, একুশ আমার একুশ। তোর মায়ের দুহাত নেই তাতে কি হয়েছে বাবা, তোর মায়ের কাটাহাতে যে ভাষা আন্দোলনের চিহ্ন আছে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

বসন্ত এসেছে

বেগম শামসুন নাহার

চোখের তারায় মানিক জ্বলে
লক্ষ তারার আমোদ ভিড়ের ছলে
হাজার প্রদীপ আছে জেগে
পাশের বাড়ির বসন্ত বাতাস সঙ্গে মেখে।

পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে
রমণীর চোখে ঘুম ঘুম ভাব এসেছে
বনে বনে আগুন লেগেছে
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় দোলা লেগেছে ;

মিষ্টি মধুর আহ্বানে শত কথার ফুলঝুরিতে
ভ্রমরের আলাপনে গন্ধ গোকুলেরা আমের মঞ্জুরিতে
লুকানো ভাবের আলাপে
তবুও ভোরের হাওয়া ব্যস্ত প্রলাপে।

বাংলার বসন্ত

জাহাঙ্গীর আলম

বসন্তকাল আসলে দেশে
ফুলের সুবাস ভাসে,
সোনার বাংলায় পলাশ শিমুল
গাছে গাছে হাসে।

মাঝেমধ্যে আকাশটা যে
মেঘলা মেঘলা থাকে,
পাখিগুলো দূর-দূরান্তে
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মেলায় মেলায় গ্রামবাংলার ঢোল
বাংলাদেশে বাজে,
নববধূ চুলের খোঁপায়
ফুলে ফুলে সাজে।
ফাগুন এলে কোকিল যেন
নতুন জীবন পায়,
সুরে সুরে ভেসে বেড়ায়
বাংলা মায়ের গাঁয়।

স্বপ্নসৌধ

রনি অধিকারী

হাড়ের পাহাড় থেকে জন্ম নেয়া সশস্ত্র সুন্দর
মনের করোটি হায়! দুঃস্বপ্ন বেষ্টিত দেয়ালের
ইটগুলো গুঁড়ো করে স্বপ্নসৌধ দিয়েছিল গড়ে;
রক্তক্ষয়ী একাত্তর। এ মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছে...
ক্রমাগত যুদ্ধ মৃত্যু অতঃপর শত শত স্মৃতি;
স্বজন হারানো ক্ষত, কখনোই স্মৃতিহীন নয়
বিয়োগ ব্যথার দুঃখ মুছে ফেলা যায়নি, যাবে না।
আনন্দ দিনের গান আমি গাই এই জনপদে;
এ সূর্য স্বাধীন। স্বাধীন এদেশ, মাটি, রৌদ্র।

ভালোবাসি তবুও

এম ইব্রাহীম মিজি

তবুও ভালোবাসবো
তবুও রাখবো মনে,
দাও যত পার নিঠুর ব্যথা!
গড়ো যদি মন চায় গগনচুম্বী
দূরত্বের ইস্পাত-প্রাকার,
হৃদয়বোধ্য করে নেব সকল ভাষায়;
যতই অস্ফুটস্বরে বল না কথা
দুর্বোধ্য ঋদ্ধতায়!

ফাগুনের দোলা

সাবিত্রী রানী

বনে বনে লাগল ফাগুনের দোলা
মনে জাগল নতুন সাড়া
দখিনা হওয়ায় প্রকৃতিকে রাঙায়
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া।

আজ কিশলয়গুলো ভরে উঠে
নতুন নতুন পাতায়
ফুলের সুবাসে হই মাতোয়ারা
মুকুল শাখায় শাখায়।

দিক্ দিগন্তে ছুটে চলছে ভ্রমর
কেন কীসের আশায়
বসন্তের প্রাতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে
সব জেগে উঠে ধায়।

বসন্তবরণ

সোহেল রানা

শুধু চারুকলা প্রাঙ্গণই নয়
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসই নয়
অমর একুশে গ্রন্থমেলায়ই নয়

রাজধানী ছড়িয়ে
আজ মাধবীলতা ভালোবাসার অবারিত দুয়ারে
লাল-নীল; হিমু প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সময় করছে পার
কেউ কপালে টিপ, মাথায় খোঁপা
কেউবা কানে গুঁজে দিয়েছেন গোলাপ তরতাজা;
প্রত্যয়ের বিনিময় প্রকাশে ফুল
আর হাতে হাত রেখে চলতে চলতে পথও ধরেছে গান–
আহা, রিনিঝিনি লাল চুড়ি– প্রেমিকার লাল শাড়ি
সেই শব্দও যেন আন্দোলিত করছে
লাল অথবা সফেদ পাঞ্জাবি।

মুক্তির গান

আনসার আনন্দ

খাঁচার পাখি বলছে ডাকি
দাও না আমায় ছাড়ি,
ঐ দূরবনে উড়ে যাবো
যেথায় আমার বাড়ি।
আকাশ দেশে মেঘের মেয়ে
নূপুর পায়ে নাচে,
তেমন করে সবাই মিলে
নাচব গাছে গাছে।
শিকল খুলে দাও উড়িয়ে
আকাশ ঠিকানায়,
মুক্তির গান গেয়ে যাবো
ভোরের আঙিনায়।

আরাধনা

আশরাফ পিন্টু

একজন লোক বসেছিলেন অন্ধকারে
গাছের গোড়ে।
হেঁটে যেতে এক পথিক তাকে জিজ্ঞেস করল,
আপনি এখানে একাকী কেন বসে আছেন?
তিনি বললেন, বসেন।
এরপর একটু থেমে বললেন, অন্ধকারের করছি আরাধনা আমি
যা বহু মূল্যবান, আমার কাছে অনেক দামি।
– ঈশ্বর, দেব-দেবী রেখে অন্ধকারের আরাধনা!
– আমি তো অন্ধ, তাই সোনা
করছি অন্ধকারের আরাধনা।

ট্রেন এবং একটি বালক

অসীম বিভাকর

বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন প্রস্থান দেখে
একদল হাঁস
ভুলে যায় সাঁতারের সমূহ কৌশল।

মলিন হতে হতে বইয়ের মলাট
পরিত্যক্ত টায়ারের মতো
ভারী করে তোলে গুদামঘরের বোঝা।

ফলদবৃক্ষের ছবি আঁকতে গিয়ে
শিল্পীর তুলি
এঁকে ফেলে বিষাদগ্রস্ত পশুর কঙ্কাল।

একটি বালক
দোকানের বেঞ্চিতে বসে দেখে প্রতিদিন
ট্রেনখানি শূন্যে মিলিয়ে যায়।

আমার সবুজ গাঁও

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

ঐ যে দূরে দেখা যায়, ঐ যে দূরের গাঁও
এই পথেরই শেষে দেখবে, সবুজ খেতে লাউ।
সবুজ খেতটা পাড়ি দিলেই, দেখবে আমার বাড়ি
সেখানেতে চলে না ভাই, রেল ইঞ্জিনের গাড়ি।

সেখানেতে দেখতে পাবে, নদীর ঘাটে নাও
নৌকা দিয়ে যেতে পারবে, যেখানে যেতে চাও।
চারদিকে দেখবে তুমি, সবুজ সবুজ গাছ
পুকুরেতে দেখতে পাবে, হরেক রকম মাছ।

গাছে গাছে দেখতে পাবে, পাখির কলতান
বটের মূলে শুনতে পাবে, রাখালি বাঁশির গান।
বিজলিবাতি নেই সেখানে, রাতটা অন্ধকার
আলোর বাতি নেই বলে ভাই, ভয় নেই তোমার।

দেখবে তুমি কেমন করে, জ্বলে তেলের বাতি
পড়াশুনা-গল্প করে, কাটিয়ে দেই রাতি।
আমার বাড়ির চারপাশে, দেখবে সবুজ ধান
মেয়েরা ধান ভানছে দেখবে, খেয়ে বাটার পান।

চারদিকে ফুলের বাগান, ফুলের মধুর হাসি
গ্রামটা আমার সবুজবরণ, তাইতো ভালোবাসি।
এই যে দেখছ তালগাছটা, কী যে মনোরম
চারপাশে ধানের খেত, হাসছে হরদম।

এই গাঁয়ের মেঠোপথ, চলছে এঁকেবেঁকে
আসলে গ্রামে সবাই তা, অবাক হয়ে দেখে।
গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা পথ, কোথায় পাবে তুমি
গ্রামই হলো সুখের আবাস, সুখের শান্তি ভূমি।

গ্রামেই আমরা থাকি ভাই, গ্রামেই আমাদের বাস
শহরের মতো নেই আমাদের, কোনো হা-হুতাস।
এই যে সবুজ গ্রাম দেখছ, সবুজ আমাদের মন
গ্রামের মতো এই পরিবেশ, পাবে কী কখন?

আসছো যখন চলে এসো, আমার সবুজ গাঁয়ে
দেখবে কত আদর-যত্ন, করে আমার মায়ে।
গ্রামের মানুষ বলে তুমি, করো না ভাই হেলা
কত সুখে কাটবে তোমার, সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

ফিরতে তোমার চাইবে না মন, যদি গ্রামে যাও
কত সুন্দর পরিবেশ, আমার সবুজ গাঁও।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় গণমাধ্যম বেতার জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বেতার প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তে জরুরি বার্তা, নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে বেতার হতে পারে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বঙ্গভবনে তাঁর প্রণীত আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি ও স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা বই দুটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

শান্তি ও স্থিতিশীলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এসব কথা উল্লেখ করেন। বিশ্ব বেতার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– 'বেতার ও শান্তি' (Radio and Peace)।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ বেতার ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, সন্ত্রাস, গুজব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু, করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের উপকূল ও সমুদ্রসীমা প্রহরায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ও সমুদ্রপথে এবং উপকূলীয় এলাকায় জনসাধারণের জান ও মাল রক্ষাসহ চোরাচালান প্রতিরোধ, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, মানবপাচার রোধসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি অতি পরিচিত ও বিশ্বস্ত নাম। কোস্ট গার্ডের দায়িত্বশীল ও পেশাদারি ভূমিকা চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি নিরাপদ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করতে সহায়তা করেছে এবং বন্দরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয়েছে। পাশাপাশি দেশের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় জাটকা নিধন প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের অমূল্য সম্পদ রুপালি ইলিশ সংরক্ষণ ও সরকার ঘোষিত অভয়ারণ্যে অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ বন্ধের ক্ষেত্রেও এ বাহিনী ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি কোস্ট গার্ডের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কোস্ট গার্ড মাদকবিরোধী অভিযানেও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। সরকারের যুগোপযোগী দিক নির্দেশনায় কোস্ট গার্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও সাহাবুদ্দিনের সাক্ষাৎ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও তাঁর সহধর্মিণী রাশিদা খানম। এসময় নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানান মোঃ আবদুল হামিদ। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাতের সময় নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। আরও ছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৩'-এর উদ্বোধন করেন। বাংলা একাডেমি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২৪শে জানুয়ারি 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

আয়োজিত এ বছরের বইমেলার প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। এ অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ পাওয়া ১৫ কবি, লেখক ও গবেষকের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সাতটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত *শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলী-১*, *কারাগারের রোজনামচা– পাঠ বিশ্লেষণ*, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী– পাঠ বিশ্লেষণ* ও *আমার দেখা নয়াচীন– পাঠ বিশ্লেষণ;* রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রচিত *আমার জীবন নীতি*, *আমার রাজনীতি* এবং *জেলা সাহিত্য মেলা ২০২২ (১ম খণ্ড)*। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোটো মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর ছোটো বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মহাপরিচালক মোহাম্মদ নূরুল হুদা। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী স্মারকে স্বাক্ষর করে বইমেলা উদ্বোধনের পর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি চাই, আমাদের দেশটা এগিয়ে যাক। এই দেশ আর পেছনে ফিরে যাবে না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তাতে এই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে পেরেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ চালু করেছি। মেট্রোরেল চালু হয়েছে। পাতালরেল চালু হবে। কর্ণফুলী নদীতে টানেল করে দিচ্ছি। পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে করে দিয়েছি। আর এসব স্থাপনায় আনসার বাহিনী বিশেষভাবে জড়িত ছিল। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় একটি উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

দেশের সব অনাবাদি জমিকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির কারণে অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তার সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা গেছে। আমাদের এখান থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। যত অনাবাদি জমি আছে, সব আবাদ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি, আমাদের আনসার বাহিনী, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কুচকাওয়াজে মুগ্ধতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এই বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গ্রেডে উন্নত করা এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বিশেষায়িত গ্রেড ও নতুন ব্যাটালিয়ন দল গঠন করে দিয়েছি। বেতন বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইউনিয়ন ব্যাটালিয়নদের মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সাধারণ আনসার সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধি ও নতুন রেশন সামগ্রী সংযোজন করা হয়েছে। হিল আনসারদের স্থায়ীকরণের কার্যক্রমও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আধুনিক সুবিধাসংবলিত ২৭টি উপজেলায় দৃষ্টিনন্দন অফিস ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে নয়টির কাজ শেষ হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের আনসার বাহিনী যেন চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতা, বীরত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা, একনিষ্ঠতা, সততা, দূরদর্শিতা, মমত্ববোধ প্রভৃতির দৃষ্টান্তপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে ৮টি ক্যাটাগরিতে ১৮০ জনকে সাহসিকতা ও সেবা পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবিকে ভিত্তি ধরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য 'স্বাধীনতার পথে', ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ১২ জন আনসার সদস্যের 'গার্ড অব

অনার' প্রদানের ভাস্কর্য এবং একাডেমির মূল ফটকের দুই পাশে নির্মিত ম্যুরাল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ডিসিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ২৫ নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ২৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি শুধু প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে বলেন। ২৪শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন ২০২৩ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের এখনই প্রয়োজন, শুধু সেগুলোই গ্রহণ করতে চাই। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারিকালে ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় সারা বিশ্ব এখন হিমশিম খাচ্ছে। অনেক উন্নত দেশও অর্থনৈতিক মন্দার দেশ হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দিয়েছে। কাজেই আমাদের যেন সেটা করতে না হয়, সে জন্যই আমরা কৃচ্ছ্রসাধনের ঘোষণা দিয়েছি। আমাদের অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ফেলেছি এবং সে ব্যাপারেও আপনারা সচেতন থাকবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ডিসিদের বিবেচনা করতে হবে, যখনই কোনো প্রকল্প নেওয়া হয়, সেটা ওই এলাকার জন্য কতটুকু কার্যকর। এতে মানুষ কতটুকু লাভবান হবে, অপচয় কতটুকু বন্ধ করা যায়, সেদিকে ডিসিদের নজরদারি থাকা উচিত। যেহেতু একটা জেলার দায়িত্ব ডিসিদের ওপর, স্বাভাবিকভাবে এগুলো তারা দেখবেন।

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১১টি প্রকল্প উদ্বোধন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণপূর্ত অধিদফতরের ৬টি, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ৩টি এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২টিসহ সর্বমোট ১১টি সমাপ্ত প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩০শে জানুয়ারি গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে রাজধানীর রমনা পার্কে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে– গণপূর্ত অধিদফতর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বাস্তবায়িত ঢাকার আজিমপুর, তেজগাঁও, মিরপুর ও নোয়াখালীতে ২১৩০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, রমনা পার্কের সৌন্দর্য বর্ধন ও সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ, সুপ্রিম কোর্ট বার লাইব্রেরি ভবন নির্মাণসহ এনেক্স বিল্ডিং ও অডিটোরিয়াম সংস্কার কাজ, পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রথম ফেইজ, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় প্রগতি উচ্চবিদ্যালয়, পলখান উচ্চবিদ্যালয় ও পূর্বাচল আদর্শ কলেজ ভবনের নির্মাণকাজ। জিওবি খাত ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

তৈরি পোশাকের নতুন বাজার খোঁজার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যারা পোশাক এবং তা রপ্তানি নিয়ে কাজ করছেন তাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে। পরিবর্তীত বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন ও বাজার খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছয় জেলায় ছয়টি টেক্সটাইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

আসন্ন ৪র্থ শিল্পবিপ্লবে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বড়ো ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এজন্য তাঁর সরকার দেশের জনগণকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, দ্রুততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র অধিদপ্তরে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সেবা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বস্ত্র ও তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা এখন সহজে এবং স্বল্প সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সব সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। পাশাপাশি বস্ত্র খাতে কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকার বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি) ১৬টি বন্ধ মিল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ পদ্ধতিতে (পিপিপি) চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে ৪৫ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। সেদিক থেকে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটা বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে এই তৈরি পোশাক খাত। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

২৫টি দেশকে পেছনে ফেলে ৩৫তম জিডিপির দেশ বাংলাদেশ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে আমাদের সরকার গঠনের সময় বাংলাদেশ ছিল ৬০তম অর্থনীতির দেশ, গত ১৪ বছরে আজকে সেটি ৩৫তম অর্থনীতির দেশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বদলে গেছে এবং বদলে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া জিডিপির আকারে আমাদের চেয়ে ছোটো অর্থনীতির দেশ, পাকিস্তান তো বটেই কোনো কোনো সমীক্ষা মতে বাংলাদেশের অবস্থান পিপিপিতে ৩১তম উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে সাড়ে ৯ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকত, তাহলে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এমনকি সিঙ্গাপুরের আগেই পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার গল্প শুনত। ৯ই জানুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের জহির রায়হান হলে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রকাশিত সাম্প্রতিক 'দি টপ হেভি গ্লোবাল ইকোনমি' তালিকায় ৩৫তম স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

গত বছরের অসামান্য অর্জনের চিত্র তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচার

মন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে পৃথিবীর জন্য একটি দুঃসময় কেটেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে গতবছর এবং কোনো কোনো দেশে করোনা মহামারি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই পরিস্থিতির মধ্যে নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করে প্রধানমন্ত্রী সেটি উদ্বোধন করেন, ঢাকায় মেট্রোরেলের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিদেশি গণমাধ্যমে দেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকা ঢাকায় মেট্রোরেল শুরু হওয়ার পর একটি ফিচারে লিখেছে– ঢাকার মেট্রোরেল আমাদের অনেক পরে শুরু হলেও আধুনিকতার দিক দিয়ে কলকাতার চেয়ে এগিয়ে। ... এবং তিন দশক পরেও কলকাতায় মেট্রোরেলে কোনো মহিলা চালক নেই। আর ঢাকার প্রথম মেট্রোরেল একজন মহিলা চালিয়েছে এবং ছয় জন চালক মহিলা। অর্থাৎ দেশের উন্নতির সাথে সাথে এখানে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, একাত্তর সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করলেও আমাদের স্বাধীনতা তখনও পূর্ণতা পায়নি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালির জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগান শিখিয়েছেন, এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে যাঁর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা এসেছে, ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি সেই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনেই আমাদের স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা পেয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভিডিওতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এক কোণায় বসে আছেন, আর ছেলে বঙ্গবন্ধু মুজিব জনতার কাছে। কারণ জাতির পিতা মুজিব তখন শুধু শেখ লুৎফর রহমানের সন্তান নন, তিনি জনগণের মুজিব। এটিই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরে 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক সংকট, নানা ষড়যন্ত্র ও সমস্ত নেতিবাচক দিক মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের চার বছর পূর্তি হচ্ছে। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিকভাবে ১৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। গত এক বছর করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিশ্বব্যাপী নানা সংকট ছিল। এরপরও দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। ২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যেভাবে করোনা মোকাবিলা করেছেন, বিশ্ব সম্প্রদায় তার প্রশংসা করেছে জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, নিক্কি ইনস্টিটিউট ও ব্লুমবার্গের যৌথ জরিপ বলছে– বাংলাদেশ করোনা মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশ্বে পঞ্চম, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম।

তিনি বলেন, বিশ্বসংকট ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেও বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সহনীয় পর্যায়ে আছে। আমাদের মূল্যস্ফীতি ইউরোপ ও অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কম হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে আমাদের রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে, রপ্তানি আয় বেড়েছে। গত কয়েক মাসেও রপ্তানি আয় বেড়েছে। বিশ্বের ১৩২টি দেশ যখন করোনা টিকা শুরু করতে পারেনি, আমাদের দেশে তখন শেখ হাসিনা করোনার টিকা দেওয়া শুরু করেছিলেন।

সাংবাদিক সহায়তা চেক বিতরণ

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, এটি নির্বাচনের বছর। সাংবাদিকরা জনমত গঠন করে, মানুষের মনন তৈরি করে। অবশ্যই সাংবাদিকরা সমালোচনাও করবেন, কিন্তু একটি কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে– দেশ কি এগুবে, না কি পশ্চাৎপদ হবে! দেশ কি পাকিস্তান হবে, না কি মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর হবে!

দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন দেশের জন্য এবং জাতির জন্য অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। কারণ সেই নির্বাচনে ফয়সালা হবে দেশের যে উন্নয়ন অগ্রগতি চলমান সেটি অব্যাহত থাকবে না কি দেশ আবার পশ্চাৎপদ হবে। সে জন্য আমি তথ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে আপনাদের সহযোগিতা চাই। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একজন সাংবাদিকবান্ধব নেত্রী। তাঁর সরকার সাংবাদিকবান্ধব সরকার। সে কারণেই সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সাংবাদিকদের সহায়তা করা হচ্ছে। এর বাইরেও প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব ঐচ্ছিক তহবিল থেকে মাঝে মধ্যেই সাংবাদিকদের সহায়তা করে থাকেন। ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় থাকলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে সমাধান করা হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত

২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫। এ পরীক্ষায় এবার জিপিএ- ৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ শিক্ষার্থী। ৮ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এদিন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে কম্পিউটারের বোতাম চেপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তাঁর কার্যালয়ে ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

অভিভাবক হিসেবে শুধু মায়ের নামও লেখা যাবে

শিক্ষা ও পাসপোর্টসহ সরকারি যে-কোনো ফরম পূরণের ক্ষেত্রে বাবার পাশাপাশি মায়ের নামও আইনগত অভিভাবক হিসেবে যুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট। ২৪শে জানুয়ারি ১৪ বছর আগে এ বিষয়ে করা এক রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট এ রায় দেয়। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চের এ রায়ের ফলে এখন থেকে বাবা ছাড়াও শুধু মায়ের নাম দিয়েই ওইসব ক্ষেত্রে ফরম পূরণের সুযোগ সৃষ্টি হলো। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আইনুন নাহার সিদ্দিকা, এস এম রেজাউল করিম ও আয়েশা আক্তার। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশ গুপ্ত।

রায়ের পর আইনজীবী আইনুন নাহার সিদ্দিকা বলেন, রাজশাহী বোর্ডে এসএসসি ও এইচএসসির ফরম পূরণের জন্য বাবার নাম না দেওয়ায় এক শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন হয়নি। এ ঘটনায় পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। সেই প্রতিবেদন যুক্ত করে ২০০৯ সালে আমরা জনস্বার্থে একটি রিট করি। সেই রিটে আজকে রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি জানান, রায়ে আদালত বলেছে, বাবা অথবা মা কিংবা কোনো আইনগত অভিভাবক হিসেবে কারও নাম দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে পারবে শিক্ষার্থী। এমনকি পাসপোর্টসহ সরকারি যে-কোনো ফরম পূরণের ক্ষেত্রে এমনটি করা যাবে। সরকারকে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা বাতিল

করোনার সংক্রমণের কারণে তিন বছর ধরে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা হয়নি। নতুন শিক্ষাক্রমেও এই পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা নেই। এমন অবস্থায় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুই পাবলিক পরীক্ষা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অনুমোদন দিয়েছেন। ২০০৯ সালে হঠাৎ করেই জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে সরকার। প্রথমে শুধু সাধারণ ধারার শিক্ষায় এটি সীমাবদ্ধ ছিল। পরে মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী (পঞ্চম শ্রেণির সমমান) পরীক্ষাও চালু করা হয়। এরপর ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু করোনার সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের মার্চে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। টানা প্রায় ১৮ মাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এজন্য গত তিন বছর এ পরীক্ষাগুলো হয়নি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

বয়স ৬০ বছর হলে নাগরিক পেনশন

সব নাগরিককে পেনশনের আওতায় আনতে সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২৩' পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬০ বছর পর আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন

নাগরিকরা। এই সুবিধা পেতে ১৮ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সি নাগরিকদের নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হবে। ২৪শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে বিলটি স্থিরকৃত আকারে পাস হয়।

এছাড়া বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্বরাও এই আইনের আওতায় নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা পরিশোধ করে পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে স্কিমে অংশগ্রহণের তারিখ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান শেষে তিনি যে বয়সে উপনীত হবেন, সে বয়স থেকে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন। আজীবন বলতে পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে।

পেনশন আইনে বলা হয়েছে, চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দিলে মাসিক পেনশন পাবেন। চাঁদাদাতার বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন তহবিলে পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন দেওয়া হবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। আইনে আরও বলা আছে, নিম্ন আয়ের নাগরিকদের অথবা অসচ্ছল চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসেবে দিতে পারবে।

বিলে বলা হয়েছে, একজন পেনশনার আজীবন পেনশন সুবিধা পাবেন। তবে পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে তার নমিনি অবশিষ্ট সময়ের জন্য (৭৫ বছর পর্যন্ত) মাসিক পেনশন পাবেন। চাঁদাদাতা ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার আগে মারা গেলে জমা করা অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেওয়া হবে।

এছাড়া পেনশনের জন্য জমা দেওয়া অর্থ, কোনো পর্যায়ে এককালীন তোলার প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসেবে তুলতে পারবেন, যা ফিসহ পরিশোধ করতে হবে। পেনশন থেকে পাওয়া অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে।

সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে সরকারি অথবা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারবে। এক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ নির্ধারণ করবে কর্তৃপক্ষ। তবে সরকারি সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত থাকবেন।

ই-পাসপোর্টে পাবে ৬৫ উর্ধ্ব ব্যক্তিও

৬৫ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তিরাও ১০ বছর মেয়াদের ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ বিষয়ে ২৩শে জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে শূন্য থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যারা ই-পাসপোর্ট করবেন, তাদের আগের নিয়মেই পাঁচ বছর মেয়াদের ই-পাসপোর্ট নিতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সারে পরিপত্রে ৬৫ বছরের বেশি বয়সের কোনো ব্যক্তি পাসপোর্ট করতে গেলে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের করতে পারবেন না বলে নির্ধারণ করা হয়। ২০২০ সালে ই-পাসপোর্টের যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে। ই-পাসপোর্ট করতে গিয়ে তখন ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের সুযোগ হয়ে ওঠেনি ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট করার।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্বাধীনতা দিবসে নিজেদের তৈরি রকেট উৎক্ষেপণ

স্বাধীনতা দিবসে দেশের আকাশে প্রথমবারের মতো নিজেদের তৈরি রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ১৮ই জানুয়ারি রাজধানী মহাখালীতে বিএএফ শাহীন হলে রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ২৬শে জানুয়ারি ঢাকায় বিআইসিসিতে তিন দিনব্যাপী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আগামী ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে দেশের আকাশে প্রথমবারের মতো উৎক্ষেপণ করা হবে নিজেদের তৈরি রকেট। স্বাধীনতা দিবসে ময়মনসিংহের শিক্ষার্থী নাহিয়ান আল রহমানের তৈরি করা রকেট ওড়ানো হবে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ১২৪ জনকে পেছনে ফেলে রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় সেরা মনোনীত হয়েছেন নাহিয়ান। পুরস্কার হিসেবে নাহিয়ানের হাতে ৫০ লাখ টাকার

চেক তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এসময় তিনি স্বাধীনতা দিবসে নাহিয়ানের রকেট আনুষ্ঠানিকভাবে উৎক্ষেপণ করার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের শুরুতে দেশে প্রথমবার রকেট বানিয়ে সাড়া ফেলেন ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাহিয়ান আল রহমান। দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণায় ধূমকেতু নামে ১০০ কেজি ওজনের চারটি রকেট তৈরি করেন নাহিয়ান। যা ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে আবহাওয়ার তথ্য নিতে পারে। তবে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় রকেটগুলোর আনুষ্ঠানিক উৎক্ষেপণ আটকে ছিল। অবশেষে নাহিয়ানের অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে।

বিশ্বজয়ী প্রযুক্তিবিদ তৈরি হবে দেশে

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরির লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট লিডারশিপ তৈরি হবে এখান থেকে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন ভিশন দিয়েছেন ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ। ৩১শে জানুয়ারি মাদারীপুর শিবচরের কুতুবপুরে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিকেএসপি থেকে যেমন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান তৈরি হয়েছে, একইভাবে বিশ্ববিজয়ী প্রযুক্তিবিদ তৈরি হবে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি থেকে।

তিনি আরও বলেন, এ স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সেটি হলো– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমিক, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে একটি একাডেমিক ভবন, একটি বিজনেস এরিয়া থাকবে। ২০৪১ সালকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০ একর জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৭০ একর জায়গার ওপর ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে '২০৪১ টাওয়ার' (৪১ তলাবিশিষ্ট টাওয়ার) এখানে নির্মাণ করা হবে।

ক্যাশলেস সোসাইটি করতে ডিসিদের নির্দেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৬শে জানুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের শেষ দিনের তৃতীয় অধিবেশনে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। অধিবেশন শেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের ভিশনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চারটি স্তম্ভ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সোসাইটি) গড়ে তোলার জন্য আমরা জেলা প্রশাসকদের মৌলিক কিছু নির্দেশনা দিয়েছি। যেমন পেপারলেস অফিস ওয়ার্ককে উৎসাহিত করা, ক্যাশলেস সোসাইটি করা। এর জন্য এবছর থেকে আমরা আইসিটি ডিভিশন থেকে স্মার্ট জেলা ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের উপাত্ত সুরক্ষা আইন অত্যন্ত আধুনিক হবে, ভবিষ্যৎমুখী হবে এবং উদার হবে। কারণ অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রুলস, এগুলোর সবগুলোকে আমরা অনুশীলন করে এবং দেশে-বিদেশে আমাদের স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে যে সুপারিশগুলো পেয়েছি তার ভিত্তি একটা আইনের খসড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি। আমরা আশা করছি, আমাদের এ ডেটা প্রোটেকশন আইনটি বর্তমান বিশ্বে অন্যতম একটি ভবিষ্যৎমুখী ও উদার আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানি সরকারের কাজ করে, তারা সেই তথ্য-উপাত্ত সেই সংস্থার ও ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তারা দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত যে আমাদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, সেটার প্রয়োজনীতা অনেক বেশি বেড়েছে।

ডিজিটাল সংযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম বাহন

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সংযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম বাহন বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিদ্যমান ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা অপরিহার্য। শিক্ষার পদ্ধতি হতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় পদ্ধতিতে। এর ফলে তারা আনন্দের সাথে সহজে পাঠ গ্রহণ ও ধারণ করতে পারবে।

১১ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে 'ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে মিশেল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। আন্তর্জাতিক সংগঠন জেইআইএসটি এ সেমিনারের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় শিখন ও শেখানোর পদ্ধতিসমূহকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সড়কের নাম হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক। কোভিডকালে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্যসহ এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমে করা হয়নি।

মিশেল শিক্ষা পদ্ধতির জন্য নানা আধুনিক মডেল প্রচলিত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেগুলো সহজ, আনন্দময়, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারঅ্যাকটিভ সেগুলো সব দেশের সব বয়সি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। তবে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য যেসব উপকরণের কথা বলা হয়েছে, তা জোগান ও সামাল দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বলেন, কোভিডকালে সফলতার সঙ্গে মোবাইল ও ইন্টারনেটের বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুটিও অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। আজকের দিনে ডিজিটাল যন্ত্র থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখা যাবে না। এটি একটি সেকেলে ধারণা। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল যন্ত্র

বিশেষ করে স্মার্টফোন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার গোঁড়ামি থেকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সরে আসতে হবে। ভালো কনটেন্ট না থাকায় অনেকে হয়ত স্মার্টফোনের অপব্যবহার করতে পারে, তবে এ থেকে তাদের নিবৃত রাখা কঠিন কাজ নয়।

তিনি আরও বলেন, দেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ শুরু করেছে। এরই মধ্যে দেশের দুর্গম অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের সুযোগ পৌঁছে দিতে ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে ডিজিটাল শিক্ষার অভিযাত্রা শুরু হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় গত ১৪ বছরে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, করোনাকালেও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সেরা সফল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

A_bxZ : we‡kl cwZ‡e`b

বিশ্বসেরা ১০০ সবুজ কারখানার অর্ধেকই বাংলাদেশে

লিড সার্টিফায়েড সবুজ কারখানার তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব ১০০ কারখানার মধ্যে ৫০টিই এখন বাংলাদেশের। ৬ই ফেব্রুয়ারি বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিন নতুন করে কেডিএস আইডিআর লিমিটেড নামের আরও একটা কারখানা প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি' স্বীকৃতি পেয়েছে। এটিসহ বিশ্বের সেরা পরিবেশবান্ধব ১০০ কারখানার তালিকার অর্ধেকই এখন বাংলাদেশের।

নতুন স্বীকৃতি পাওয়া কারখানাটি নিয়ে বাংলাদেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৭টিতে। নতুন স্বীকৃতি পাওয়া কেডিএস আইডিআর লিমিটেড চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকার মোহরায় অবস্থিত। কারখানাটি রেটিং পয়েন্ট ৮৪ নিয়ে প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি পেয়েছে।

'সুপারব্র্যান্ডস' অ্যাওয়ার্ড প্রদান

এবছর ১১ই ফেব্রুয়ারি 'সুপারব্র্যান্ডস' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপের চারটি ব্র্যান্ড– বসুন্ধরা পেপার, বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস এবং বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট। টানা তৃতীয়বারের মতো পেপার ক্যাটাগরিতে বসুন্ধরা পেপার এবং এলপি গ্যাস ক্যাটাগরিতে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস 'সুপারব্র্যান্ডস' অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। দ্বিতীয়বারের মতো 'সুপারব্র্যান্ডস' অ্যাওয়ার্ড অর্জন করল বসুন্ধরা টিস্যু ও বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট।

আস্থা ও ভোক্তার মনে জায়গা করে নিয়েছে বসুন্ধরা পেপার, টিস্যু, ডায়াপ্যান্ট ও বসুন্ধরা এলপি গ্যাস। এই আস্থার স্বীকৃতি হিসেবে এবার বসুন্ধরা গ্রুপের এই চারটি পণ্য অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক সম্মান 'সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-২০২৪'।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় বাংলাদেশের সানজিদা

বিবিসির প্রকাশিত ২০২২ সালের বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে সানজিদা ইসলাম। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম বিবিসির ওয়েবসাইটে ১০০ নারীর নামের এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

রাজনীতি ও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা, অধিপরামর্শ ও সক্রিয়তা এবং স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান –এই চারটি বিভাগে নারীদের স্থান নির্ধারণ করে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সানজিদা ইসলাম স্থান পেয়েছেন অধিপরামর্শ ও সক্রিয়তা বিভাগে। বিবিসির ওয়েবসাইটে সানজিদা ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাল্যবিবাহ থেকে মেয়েদের কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেই চেষ্টা করছেন সানজিদা ইসলাম।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ৩১শে জানুয়ারি ২০২৩ পূর্বাচলে ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

সানজিদা ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার আচারগাঁও ইউনিয়নের ঝাউগড়া গ্রামের মেয়ে। তিনি কিশোরগঞ্জ সরকারি গুরুদয়াল কলেজে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়ছেন। সানজিদা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০১৪ সালে তার ছয় সহপাঠীকে নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে 'ঘাসফড়িং' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যৌতুক প্রথা বন্ধেও কাজ করেন সানজিদা।

ম্যারাথনে ৮০ বছরের নারী

ভারতের মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনের ১৮তম আসরে শাড়ি পরে অংশ নিয়েছেন ৮০ বছর বয়সি এক নারী। নাম ভারতী। ১৫ই জানুয়ারি বসেছিল টাটা মুম্বাই ম্যারাথনের এ আসর। এবারের ম্যারাথনে ৪.২ কিলোমিটার দৌড়েছেন ভারতী, সময় নিয়েছেন ৫১ মিনিট। শাড়ি পরে, চশমা চোখে, গলায় প্রতিযোগিতার আইডিকার্ড ঝুলিয়ে, ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে,

পায়ে নীল রঙের স্নিকার্স পরে খুব সাবলীলভাবে দৌড়েছেন তিনি। ম্যারাথনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিদিন নিয়ম করে দৌড়াতেন তিনি। খাওয়াদাওয়া করেছেন বাছবিচার করে। উল্লেখ্য, এবার নিয়ে পাঁচবার মুম্বাই ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন এই অদম্য নারী ভারতী।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

ঘর পাচ্ছে আরও ৪০ হাজার পরিবার

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আগামী মার্চ মাসে নতুন করে ঘর পাচ্ছে আরও ৪০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার। এবার চতুর্থ ধাপে ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প আশ্রয়ণ-২-এর আওতায় দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে এ ঘরগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। এর আগে তিন দফায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ১২৯টি পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে দুই শতক জমির মালিকানাসহ সেমিপাকা ঘর দেওয়া হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, মুজিববর্ষে দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালের জুন থেকে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে দেশের সব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক ১২ই ফেব্রুয়ারি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চতুর্থ ধাপের ঘরগুলো আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহ কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হস্তান্তর করবেন।

দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন, হতদরিদ্র পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমি ও বাড়ির মালিকানা দেওয়া হয়। প্রতিটি ইউনিটে দুটি কক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের বাড়িগুলোকে টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল করতে খরচ বাড়িয়েছে এবং পরিবর্তন আনা হয়েছে নকশায়ও।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী জেলার বর্তমান লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর দেখানো পথেই বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনের প্রবাল দ্বীপ এলাকায় একটি প্রকল্প শুরু করেন। এছাড়াও প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার দেশকে একটি মানবিক, কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার মহতী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর আওতায় ঠিকানাবিহীন, আশ্রয়হীন এবং গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানে পশু পালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে বিদ্যুৎ, পানি, রাস্তাঘাটসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বীজের মানে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ভালো ফলন ও উৎপাদনশীলতার জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কাজেই বীজের মানের বিষয়ে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না। কৃষক যাতে শতভাগ আস্থার সাথে নির্দ্বিধায় বীজ ব্যবহার করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। কৃষিমন্ত্রী ১১ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বাংলাদেশ সিড কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সিড অ্যাসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কৃষিবান্ধব সরকার সার, বীজসহ কৃষি উপকরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ১৪ বছরে সার-বীজের কোনো সংকট হয়নি। বিশ্বব্যাপী সারের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকার দেশে সারের দাম বাড়ায়নি,

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিড কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

বরং আগের চেয়ে চারগুণের বেশি ভরতুকি দিয়ে যাচ্ছে। বীজের দামও বাড়ায়নি। কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে আগামীতেও সার-বীজের দাম বাড়বে না।

কৃষিঋণ মেলা ২০২৩

শেরপুর জেলায় ৬ই ফেব্রুয়ারি দুদিনব্যাপী কৃষিঋণ মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ডিসি উদ্যানে এ কৃষিঋণ মেলা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার। মেলায় প্রান্তিক কৃষকদের হাতে বিভিন্ন ব্যাংকের কৃষিঋণ চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। দুদিনব্যাপী এ কৃষিঋণ মেলায় ২৪টি ব্যাংকের শাখা অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন কৃষিঋণ বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা কৃষকদের কৃষিঋণ বিষয়ে পরামর্শ দেন। শেষ দিন স্টল মূল্যায়ন, কৃষিঋণ বিতরণ, পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলা শেষ হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ২৯শে জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের স্থানীয়ভাবে অভিযোজনের জন্য টেকসই জীবিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

পাহাড়ে বরই চাষে সাফল্য

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের বিভিন্ন স্থানে বরই বাগান করে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে চাষিরা। পাহাড়ে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে বিভিন্ন জাতের বরই। স্বল্প খরচে অধিক লাভ হওয়ায় বরই চাষে ব্যাপক আগ্রহী হয়ে উঠছে পাহাড়ের জুমিয়া চাষিরা। বর্তমানে বান্দরবানের এই বরই স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে দেশের নানান প্রান্তে।

বান্দরবানের আবহাওয়া ও মাটি বরই চাষের উপযোগী পাহাড়ে বেশ ফলনও পাচ্ছে। তাই পাহাড়ের কৃষকরা বরই চাষে কৃষকদের নানা ধরনের পরামর্শ, চারা ও সার প্রদানসহ বরই বিক্রিতে সার্বিক সহায়তা করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ।

বান্দরবান কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বান্দরবানে ১৩০০ হেক্টর জমিতে ৭.৪৬ মেট্রিক টন বরই উৎপাদন হয়। আর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বান্দরবানে ১৫০০ হেক্টর জমিতে বরই আবাদ হয়েছে, যার বিপরীতে ১২ মেট্রিক টন বরই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আশা করছে কৃষি বিভাগ।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবেশ দূষণবিরোধী অভিযান

পরিবেশ দূষণের দায়ে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ৯টি যানবাহনকে ২৬ হাজার ৫০০ টাকা পাঁচটি, প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দুটি কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের ঢাকা মহানগর, ঢাকা জেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় এবং ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর চকবাজার, ডেমরা, যাত্রাবাড়ী ও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বায়ু দূষণের দায়ে একটি স্টিল মিলকে দুই লাখ টাকা, মাত্রাতিরিক্ত হর্ন দিয়ে শব্দ দূষণের দায়ে একটি যানবাহন থেকে পাঁচ হাজার টাকা এবং নির্মাণসামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ু দূষণের দায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। যাত্রাবাড়ী এলাকায় যানবাহনের কালো ধোঁয়া দিয়ে বায়ু দূষণের দায়ে আটটি যানবাহন থেকে ২১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ডেমরায় বায়ু দূষণের দায়ে অ্যালুমিনিয়াম বার তৈরির দুটি কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির আহ্বান

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ক্লিন এনার্জি ব্যবহার বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

একইসঙ্গে সরকারের প্রণীত বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ পুনরায় বিবেচনা করতে হবে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) মিলনায়তনে 'জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক নীতি বিবরণ এবং জাতীয় পরিবেশ পরিস্থিতি' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে একথা বলা হয়।

নদীর জন্য তারুণ্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ২৫শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল আয়োজিত 'নদীর জন্য তারুণ্য 'শীর্ষক সেমিনারে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরকাল পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কথা বলেছেন, কাজ করেছেন। তিনি সারা বিশ্বে পরিবেশ বিষয়ক আইনের জন্য আওয়াজ তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কাজ করে চলেছেন জাতির পিতার কন্যা। প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বেই মানুষ এখন পরিবেশ বিষয়ে অনেক সচেতন। তিনি আরও বলেন, নদী বাঁচানো শুধু সরকারের কাজ নয়, এতে জনগণের সহযোগিতাও প্রয়োজন। জনগণ সচেতন থাকলে নদী দখল ও দূষণ কমে যাবে।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সফলভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ২৬শে

ফেব্রুয়ারি বেলজিয়ামের এক সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং ক্লাইমেট চেইঞ্জের সাবেক চেয়ার প্রফেসর জিন পাসকেল ভ্যান ইয়পারসেলের সঙ্গে সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিসকক্ষে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশকে দশকব্যাপী সহায়তার জন্য বাংলাদেশ বেলজিয়ামের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

thvMv‡hvM I wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

কালশী ফ্লাইওভারে যান চলাচল শুরু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকার মিরপুরে ২ দশমিক ৩৪ কিলোমিটার কালশী ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে তিনি ইসিবি স্কোয়ার থেকে কালশী পর্যন্ত ৩ দশমিক ৭০ কিলোমিটার প্রসারিত রাস্তাও উদ্বোধন করেন, যা চার লেন থেকে ছয় লেনে উন্নীত ও প্রশস্তকরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কালশী বালুমাঠে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে ফ্লাইওভার ও রাস্তার উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমরা যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন করা–এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা চাই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। এই ঢাকা সিটিও স্মার্ট সিটি হবে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সেজন্যই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, আমরা জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি। আর সেটা করতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে।

ফ্লাইওভারটি মিরপুর, ডিওএইচএস, পল্লবী, কালশী, মহাখালী, বনানী, উত্তরা ও বিমানবন্দরের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। এতে বিমানবন্দর থেকে মিরপুর পৌঁছাতে ১৫ মিনিট লাগবে। ২০১৮ সালের ৯ই জানুয়ারি একনেক প্রকল্পটি অনুমোদন করে। এর অধীনে ইসিবি স্কয়ার থেকে কালশী পর্যন্ত ৩ দশমিক ৭০ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্তকরণ ও ২ দশমিক ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রকল্পটির আওতায় একটি পিসি গ্রিডার ব্রিজ, দুটি ফুট ওভার ব্রিজ, একটি পাবলিক টয়লেট, দুটি পুলিশ বক্স, একটি ৭ দশমিক ৪০ কিলোমিটার আরসিসি ড্রেন, একটি ১ হাজার ৭৫৫ মিটার আরসিসি পাইপ ড্রেন, ৩ হাজার ৩৮৩ মিটার যোগাযোগ তার, পৃথক সাইকেল লেন ও ছয়টি 'বাস বে' নির্মাণ করা হয়েছে।

টঙ্গী-জয়দেবপুর রেলের ডাবল লাইন উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বাংলাদেশ রেলওয়ের অপর দুটি প্রকল্পের আওতায় যুগপৎভাবে টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনের এ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী অন্য দুটি প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্মিত ঈশ্বরদী-রূপপুর এবং আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় কসবা-মন্দবাগ এবং শশীদল-রাজাপুর সেকশনের ডাবল লাইন ট্রেন চলাচলও উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের পর বাঁশি বাজিয়ে সবুজ পতাকা নেড়ে একইসঙ্গে তিনটি ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেত দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জয়দেবপুর, রূপপুর ও শশীদল স্টেশন থেকে নবনির্মিত ৬৯.২০ কিলোমিটার রেলপথ ট্রেন চলাচল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

জয়দেবপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত এ ডাবল লাইন উদ্বোধন করায় এখন জয়দেবপুর থেকে সরাসরি কমলাপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল সহজতর হলো। গাজীপুরবাসীর বহুদিনের প্রতীক্ষিত এ প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে জয়দেবপুর জংশনের পশ্চিমপাশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

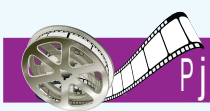

Pjw”PÎ I ms¯‹…wZ : we‡kl cwZ‡e`b

২১তম আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হয় 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র' উৎসব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত ২১তম এ উৎসব চলে ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মহান শহিদদের স্মরণ ও বাংলা সিনেমাকে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে এই উৎসবের আসর সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ।

এ বছর আয়োজনের ২১তম আসরে প্রদর্শিত হয় দুই বাংলার সমসাময়িক ও ধ্রুপদী ১৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য *হাওয়া*, *বিউটি সার্কাস*, *দামাল*, *মানিকবাবুর মেঘ* ইত্যাদি। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও একটি প্রামাণ্যচিত্র।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান করেন –পিআইডি

উৎসবের শেষদিন ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রতিবারের মতো উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন স্মরণে গতবছরের মুক্তিপ্রাপ্ত সেরা চলচ্চিত্রটিকে 'হীরালাল সেন পদক' প্রদান করা হয়।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২১তম আসরের পর্দা উঠে ১৪ই জানুয়ারি। এদিন জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উৎসবের উদ্যোক্তা রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ।

শিল্পকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনের অনুষ্ঠানিকতা। এবারের আয়োজনে বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ৭১টি দেশের ২৫২টি ছবি ছিল। এরমধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ছিল ১২৯টি, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ছিল ১২৩টি, যার মধ্যে বাংলাদেশের ছবি ৮১টি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *জেকে-৭১* প্রদর্শিত হয়। এসময় চলচ্চিত্রটির নির্মাতা ফখরুল আরেফীন খানসহ শিল্পী ও কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

বরাবরের মতো এবারের উৎসবে এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, ট্রিবিউট, বাংলাদেশ প্যানোরোমো, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিল্ড্রেন ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম বিভাগে প্রতিযোগিতা করে অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্রগুলো। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের পর্দা নামে ২২শে জানুয়ারি।

এশিয়ান চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে রাশিয়ার সিনেমা *পোডেলনিকি*-এর জন্য সেরা সিনেমাটোগ্রাফি পুরস্কার বিজয়ী হন আর্টিওম আনিসিমভ। ভারতের *অপরাজিত* সিনেমার জন্য সেরা স্ক্রিপ্ট রাইটার অনিক দত্ত এবং ভারতের *প্রপেদা* সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান কেতকী নারায়ণ।

এছাড়া, জাপানের সিনেমা *নাকোডো-ম্যাচমেকারস*-এর জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন ইক্কেই ওয়াতানাবে। ইরানি সিনেমা *জেন্দেগি ভা জেন্দেগি*-এর জন্য পুরস্কৃত হন পরিচালক আলী ঘাভিতান। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় ইরানি সিনেমা *দ্য মাদার*। বিশেষ অডিয়েন্স পুরস্কার জয়ী চলচ্চিত্র বাংলাদেশ থেকে *জেকে-১৯৭১* এবং অডিয়েন্স পুরস্কার জয়ী সিনেমা হলো বাংলাদেশ থেকে *হাওয়া*।

স্পিরিচুয়াল ফিল্ম সেকশনে সেরা তথ্যচিত্র *মহাত্মা হাফকাইন* (রাশিয়া), সেরা ফিচার ফিল্ম *ঘোর ফেরা*। বাংলাদেশ প্যানোরমা সেকশনে সেরা চলচ্চিত্র অ্যাওয়ার্ড পায় বাংলাদেশের সিনেমা *সাঁতাও*।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধন শেষে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সাতটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনসহ 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২' বিজয়ীদের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবার বইমেলায় নতুন-পুরোনো মিলিয়ে ১৩৬টি বই প্রকাশ করবে বাংলা একাডেমি। তার মধ্যে বইমেলার প্রথম দিনে *শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলী*, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী-পাঠ বিশ্লেষণ*, *আমার দেখা নয়াচীন-পাঠ বিশ্লেষণ*, *কারাগারের রোজনামচা-পাঠ বিশ্লেষণ*, হাসান আজিজুল হকের *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এর ইংরেজি অনুবাদ *দ্য লেটার অব সাবিত্রী*-এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।

বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে এ বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ পান ১৫ জন।

তারা হলেন– কবিতায় ফারুক মাহমুদ ও তারিক সুজাত, কথাসাহিত্যে তাপস মজুমদার ও পারভেজ হোসেন, প্রবন্ধ/

গবেষণায় মাসুদুজ্জামান, অনুবাদে আলম খোরশেদ, নাটকে মিলন কান্তি দে ও ফরিদ আহমদ দুলাল, শিশুসাহিত্যে ধ্রুব এষ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় মুহাম্মদ শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় সুভাষ সিংহ রায়, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশবিজ্ঞানে মোকারম হোসেন, আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনিতে ইকতিয়ার চৌধুরী এবং ফোকলোরে পুরস্কার পেয়েছেন আবদুল খালেক ও মুহম্মদ আবদুল জলিল।

বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ২৬শে জানুয়ারি ২০২৩ গাজীপুরে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে জাতীয় পর্যায়ের 'শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সাফ শিরোপা জিতল বাংলাদেশ

চার জাতির সাফ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এর ফাইনালে নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করেছে অপরাজিত স্বাগতিক বাংলাদেশ। ৯ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে এই জয় পায় স্বাগতিকরা। প্রতিযোগিতায় হিমালয়ান জাতির বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের টানা দ্বিতীয় জয়। এর আগে গ্রুপ পর্বে নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল স্বাগতিকরা।

২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ নারী দল আটটি সাফ বয়সের গ্রুপ টুর্নামেন্টে ফাইনালে পৌঁছেছে। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশি নারীদের পঞ্চম শিরোপা। চারটি বিভিন্ন বয়সের গ্রুপে এবং অপরটি জাতীয় (সিনিয়র) পর্যায়ের।

গত সেপ্টেম্বরে কাঠমুন্ডুতে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ নারী দল তাদের প্রথম সাফ নারী (সিনিয়র) চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জিতে ইতিহাস তৈরি করে। এর আগে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে ঢাকায় ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ একটি অপরাজিত রেকর্ডের সঙ্গে জিতেছিল। এছাড়াও তারা ২০১৮ সালে ভুটানে অপরাজিত থেকে সাফ-১৮-এ নেপালকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল। ঢাকায় ২০২১ সালে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল বাংলাদেশ।

টুর্নামেন্ট সেরা বাংলাদেশের শামসুন্নাহার

গোটা টুর্নামেন্টেই দাপুটে ফুটবল খেলেছিলেন শামসুন্নাহার। প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে একটি গোল করেছিলেন। ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। সেমিফাইনালে দুর্দান্ত খেলেছেন কিন্তু গোল পাননি। তবে ফাইনালে ঠিকই স্কোরশিটে নাম লেখান অধিনায়ক। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টে পাঁচ গোল এসেছে তার পক্ষ থেকে। নেতৃত্ব ও পারফরম্যান্স দুটোতেই ছিলেন সবার সেরা।

এশিয়ান র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ইমরানুর

৬০ মিটার স্প্রিন্টের হিটে সবাইকে চমকে দিয়েছেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব। একের পর এক সুখবর আসছে অ্যাথলেট ইমরানুর রহমানের জন্য। বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ১১ই ফেব্রুয়ারি কাজাখস্তানে ৬০ মিটারে জিতেছেন সোনা। ইমরানুরের এমন পারফরম্যান্সের প্রভাব পড়েছে এশিয়ান অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের র‍্যাঙ্কিংয়েও।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এশিয়ান র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে কোনো বাংলাদেশি অ্যাথলেটের নাম। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এশিয়ান অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত ৬০ মিটার স্প্রিন্টের র‍্যাঙ্কিংয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে আছেন ইমরানুর। তার সঙ্গে শীর্ষে রয়েছেন জাপানের অ্যাথলেট সুহেই তাদা ও চীনের বিংতিয়ান সু। এই ইভেন্টে বর্তমান এশিয়ান রেকর্ডধারী সু।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

চলে গেলেন মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক জহুরুল হক মুন্সি

আফরোজা রুমা

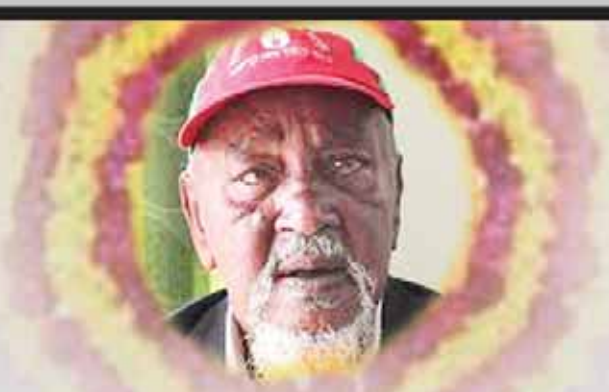

মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক জহুরুল হক মুন্সি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। জহুরুল হক মুন্সি ১৯৪৪ সালে জামালপুর জেলার বকশিগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রাবাজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল গফুর মিয়া একজন কৃষক ছিলেন।

একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী মিত্রশক্তি ভারতের প্রথম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি (১ম এমএলআই) রেজিমেন্টের সাথে জহুরুল হক মুন্সি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। প্রথম এমএলআই-এর নাম তখন 'জঙ্গী পল্টন'। এই জঙ্গী পল্টনের সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন জহুরুল হক মুন্সি। ১৯৭১-এর ৮ই নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি জঙ্গী পল্টনের হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে সংগঠিত সব যুদ্ধে অংশ নেন।

জহুরুল হক মুন্সি সম্মুখ যুদ্ধের ময়দানে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়ে উঠেছিলেন প্রথম এমএলআই-এর একজন নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে। বাঙালি কমান্ডার মুন্সির পরামর্শ ও ভ্যানগার্ড-তুল্য নেতৃত্ব পুরো জঙ্গী পল্টনের যুদ্ধাভিযানকে ক্রমাগত নির্ভুল, লক্ষ্য ভেদী ও নিরঙ্কুশ সাফল্য এনে দেয়।

জহুরুল হক মুন্সির সবচেয়ে বীরোচিত অবদান ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করে জামালপুরে অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তানি গ্যারিসনে ৩১ বেলুচের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান সম্বলিত চিঠি নিয়ে স্বশরীরে হাজির হওয়া এবং এ চিঠির উত্তরসহ জীবিত অবস্থায় আবার ফিরে আসা। কৃষকের বেশে সাইকেলসহ সাদা পতাকা উড়িয়ে নিরস্ত্র কমান্ডার মুন্সি ১৫০০ সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্যের ক্যাম্পে গিয়ে চিঠি পৌঁছে দেন। চিঠি পড়ে গ্যারিসনপ্রধান পাকিস্তানি লে. কর্নেল সুলতান ক্ষুব্ধ হয়ে এসএমজির আঘাতে মুন্সির সামনের মাড়ির কয়েকটি দাঁত ভেঙে ফেলেন। ক্রমাগত নির্যাতনের মুখে কমান্ডার মুন্সি আশ্রয় নেন কৌশলের। ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বলেন, তিনি সাধারণ দরিদ্র কৃষক। ভারতীয় সৈন্যরা তাঁকে বাধ্য করেছে এখানে আসতে। তিনি রাজি না হলে তাঁকে মেরে ফেলা হতো-এ কারণে তিনি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি জানেন না এ চিঠিতে কী লেখা আছে। তাঁর এ কথায় কাজ হয়। নির্যাতনও বন্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কমান্ডার মুন্সিকে এক কাপ চা খাইয়ে ফিরতি চিঠিসহ ছেড়ে দেয়। জামালপুর গ্যারিসনে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের সময় কমান্ডার মুন্সি গ্যারিসনপ্রধানের দোভাষী হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন জামাতের শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী কামরুজ্জামানকে। জামালপুর গ্যারিসন থেকে ফিরতি চিঠি নিয়ে সাইকেলে করে ফেরার পথে কমান্ডার মুন্সি নারকীয় সব দৃশ্য দেখতে পান। কমান্ডার মুন্সির ভাষ্যে, 'ছাড়া পেয়ে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছি। চোখে পড়ল রাস্তার দুপাশে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ। এর মধ্য দিয়েই অনেকটা পথ এগুতে হলো। এসময় একটা নারীর কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ কানে আসে। সে একটু পানি খেতে চায়। মারাত্মক আহত দেখলাম তাকে। এরপর রাস্তার পাশ থেকে কচুপাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে পানি নিয়ে মেয়েটার মুখে ধরি তখনই চোখে পড়ে মেয়েটার কোলে একটা মৃত শিশু। মেয়েটা হয়ত তখনও জানে না তার বাচ্চাটা বেঁচে নেই।' এরকম অসংখ্য মৃতের মিছিল মাড়িয়ে মাঝ রাতে ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়াটারে ফিরে আসেন কমান্ডার মুন্সি। আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে নাখোশ পাকিস্তানিরা ফিরতি চিঠিতে আত্মসমর্পণ না করার দৃঢ়তা স্বরূপ একটি ৭.৬২ মি.মি. চাইনিজ রাইফেলের গুলি মুড়ে দিয়েছিল। কমান্ডার মুন্সির কাছ থেকে চিঠিসহ সে স্মারক পাবার পরপরই প্রথম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রির ভারতীয় কমান্ডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নেন ভোর রাতেই জামালপুরস্থ পাকিস্তানি গ্যারিসন দখলে নিবেন।

নিজের ওপর চালানো নির্মমতা আর টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়কে পড়ে থাকা অগণিত সাধারণ মানুষের মৃতদেহ কমান্ডার মুন্সিকে প্রতিশোধ পরায়ন করে তোলে। নির্বিচার গণহত্যার দুঃসহ স্মৃতি কমান্ডার মুন্সির মনোজগত বদলে দিয়েছিল। ভোর রাতে অসুস্থ শরীর নিয়েও পাকিস্তানি গ্যারিসন দখলের যুদ্ধে কমান্ডার মুন্সির রুদ্রমূর্তি দেখা যায়। মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে কমান্ডার মুন্সি নিরঙ্কুশ লড়াই চালিয়ে যান। জনশ্রুতি আছে, কমান্ডার মুন্সির গান পয়েন্ট থেকে সেদিন নিস্তার পায়নি জামালপুর গ্যারিসনের কোনো জীবিত পাকিস্তানি সেনা। এদিন এই যুদ্ধে ৬১ জন পাকিস্তানি জীবিত যুদ্ধবন্দি, ২৩ জন আহত আর ২৩৫ জনের মৃতদেহসহ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

বাংলাদেশ সরকার কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতির জন্য একই পদক দুইবার প্রদান করলে তাঁর নামের শেষে 'বীরত্ব' উপাধি লেখার পর প্রথম ব্রাকেটে 'বার' লেখার নিয়ম স্বীকৃত। ১৯৭১-এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে, আমাদের মহান এ মাটির সন্তান– জহুরুল হক মুন্সিই একমাত্র এই বিরল উপাধি পাওয়া বীরপুত্র।

জহুরুল হক মুন্সি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসীম সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে সরকার তাঁকে বীর প্রতীক সম্মাননা প্রদান করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখা জহুরুল হক মুন্সিই একমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি দুইবার 'বীর প্রতীক' খেতাব পেয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জহুরুল হক মুন্সি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। দুইবার বীর প্রতীক খেতাব পাওয়া এই মুক্তিযোদ্ধাকে জানাই সশ্রদ্ধ সম্মান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

mwPÎ evsjv‡`k পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 08, February 2023, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

†deªæqvwi 2023 ▪ gvN-dvêyb 1429